১৭১৫ । ৬৮৪ ।

MOHARAJAH'S LIBRARY
5 MAR 1889
COOCH BEHAR.

শকুন্তলাতত্ত্ব

অর্থাৎ

অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমালোচনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম, এ
প্রণীত।

কলিকাতা

নূতন আর্য্য যন্ত্রে

শ্রীকেদার নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ক্যানিং লাইব্রেরিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১২৮৮।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বঙ্কিম! তুমি আমাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাস বলিয়া আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি তোমার নামে উৎসর্গ করিতেছি না। তোমার ভারতভূমির প্রতি ভালবাসা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি বলিয়াই এই গ্রন্থখানি তোমাকে উপহার দিলাম। ইহাতে তোমার ভারতের এবং আমাদের জগতের এক খানি অনুপম রত্ন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

অভিজ্ঞানশকুন্তল শীর্ষক যে কয়টি প্রবন্ধ সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল।

এই পুস্তকে অভিজ্ঞানশকুন্তলের কেবল মাত্র নাটকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বলে তাহা বুঝাই নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তলে যে আশ্চর্য্য কবিত্ব আছে তাহা বুঝাইতে হইলে এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংস্করণ প্রকৃত গ্রন্থ বলিয়া তাহার ই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু যেখানে উক্ত সংস্করণের সহিত বঙ্গীয় সংস্করণের অর্থগত মিল আছে, সেখানে দুই একটি শব্দগত প্রভেদ সত্ত্বেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের সম্মানার্থ বঙ্গীয় সংস্করণ হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই সমালোচনা কার্য্যে আমি আমার দুইটি সহোদর সদৃশ বন্ধুর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। দুই জনেই সুপণ্ডিত, সুলেখক, স্বদেশহিতৈষী। তাঁহাদের মধ্যে ঋষিতুল্য শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাকবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া একটি অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কাব্যানুরাগী কবিবর শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তী নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য ব্যবসায়িগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

কলিকাতা
১৮ই কার্ত্তিক ১২৮৮।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সূচি পত্র।

পৃষ্ঠা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুষ্মন্ত-নাটকের চরিত্র ২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শকুন্তলা-নাটকের চরিত্র ৪২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা ৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ ৯৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য ব্যক্তিগণ ১১৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প ১৪৬

MAHARAJAH'S LIBRARY
5 MAR 1889
COOCH BEHAR.

শকুন্তলাতত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব।

দুর্ব্বাসার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। নচেৎ উপন্যাস মাত্র হইত। বলা অনাবশ্যক যে উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। আরব্য উপন্যাস নামক গ্রন্থে সহস্রাধিক উপন্যাস আছে; কিন্তু আরব্য উপন্যাস নাটক নহে। যে উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যচরিত্রের আভ্যন্তরিক মূল প্রদর্শন করা তাহাকেই নাটকের উপন্যাস বলে। মনুষ্যচরিত্র দুই প্রকার। যাহা বাহ্য জগতের দ্বারা অনুশাসিত হয় তাহা এক প্রকার চরিত্র এবং যাহা বাহ্য জগৎকে শাসন করে তাহা আর এক প্রকার চরিত্র। দুইটি দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ প্রভূত ধনরাশি প্রাপ্ত হইল; পাইয়া একজন গর্ব্বিত হইয়া উঠিল, আর একজন পূর্ব্বের ন্যায় বিনয়নম্র রহিল। দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের ঘটনা একজনকে বিচলিত করিতে পারিল, আর একজনকে পারিল না; একজনের মন শক্তি এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন, আর

একজনের মন তাহা নয়। বাহ্য জগৎ একজনের মনকে রঞ্জিত করিল, আর একজনের মন বাহ্য জগৎকে রঞ্জিত করিল। সিরাজউদ্দৌলা এবং প্রথম নেপোলিয়ান উভয়েই আস্ফালন প্রিয়। কিন্তু সিরাজের আস্ফালন ফকিরীতে পরিণত হইল আর প্রথম নেপোলিয়ান সমবেত ইউরোপ কর্ত্তৃক এল্‌বাদ্বীপে তাড়িত হইয়া পুনরায় সমবেত ইউরোপকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত এল্‌বাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সমরানল প্রজ্বালিত করিল। আবার মনে কর সেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর চলিতেছে। আজ শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য কৌরবসেনার অধিনায়ক। পাণ্ডবদিগের আর শ্রেয় নাই। বুঝি আজিকার যুদ্ধেই পাণ্ডবপক্ষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জনরব উঠিল যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথাটা ঠিক্ কি না? তিনি সত্যপ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মনিষ্ঠা 'ইতি—গজত্বে' পরিণত হইল। শস্ত্রাচার্য্য শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। যুধিষ্ঠিরের কি ভয়ানক আত্মহত্যা। যে মহাত্মা কখনও প্রবঞ্চনার কথা কহেন নাই, যিনি মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম ও সত্যের অবতার বলিয়া পরিচিত, যিনি সত্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সত্যকেই অক্ষয়নিধি বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই কি না আজ চিরসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্য্যের লোভে সত্য-সংহার করিলেন! একেই বলে বাহ্যশক্তি দ্বারা অনুশাসিত হওয়া—বাহ্যশক্তির দ্বারা নিধন প্রাপ্তি। নাটককার এই প্রকার আত্মহত্যা নিবারণ করেন। এমন স্থলে

আত্মহত্যা না দেখাইয়া নাটককার আত্মগৌরব দেখাইয়া থাকেন; আত্মার পরাজয় না দেখাইয়া বিজয় দেখান। যুধিষ্ঠির যদি রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া, বনবাস বিস্মৃত হইয়া, অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণায় দৃক্‌পাত না করিয়া, ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর অপমান হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়া, কেবল সত্য এবং ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া, সত্য কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার যুধিষ্ঠিরত্ব রক্ষা হইত—তিনি বরাবর যা এখনও তাই থাকিতেন—তিনি একটি নাটকোপযোগী চরিত্র হইয়া দাঁড়াইতেন। মহাকবি সেক্সপীয়রের একটি চরিত্র বুঝিয়া দেখ। প্রিয়বন্ধু বাসানিয়র উপকারার্থে উদারচেতা এণ্টোনিয় সাইলকের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া একখানি খত লিখিয়া দিলেন। তাহাতে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি তিন মাসের মধ্যে সুদ-সহিত টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন তবে সাইলক তাঁহার শরীর হইতে আধসের মাংস কাটিয়া লইবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নিরূপিত সময়ের মধ্যে এণ্টোনিয়র বাণিজ্য-পোত ফিরিল না। নিষ্ঠুর সাইলক অঙ্গীকৃত মাংস খণ্ড পাইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে অভিযোগ করিল। বিচার আরম্ভ হইল। তখন উন্নতমনা উদারচেতা পরদুঃখকাতর পরোপকারী এণ্টোনিয় কি করিলেন? তিনি তখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহাতে মহোন্নত মনও অবনত হইয়া পড়ে; উদারচিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়; পরদুঃখকাতরতা নিজদুঃখকাতরতায় বিলুপ্ত হয়; হৃদয় ফাটিয়া যায়; মন কেন্দ্রভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় অপরিচিত পথে ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্তে দৃঢ়তাপূর্ণ অন্তঃকরণে বিচারপতিকে বলিলেন—

"I have heard,
Your grace hath ta'en great pains to qualify
His rigorous course : but since he stands obdurate,
And that no lawful means can carry me
Out of his envy's reach, I do oppose
My patience to his fury ; and am arm'd
To suffer with a quietness of spirit,
The very tyranny and rage of his,"

এণ্টোনিয় আজ পথের ভিখারী ; তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য স্বপ্নদৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে ; আজ তিনি তাঁহার প্রফুল্লতাময়, করুণাজ্যোতিবিভূষিত, প্রীতিপূর্ণ হাস্যময় গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন ! তবুও তাঁহার এই রকম কথা। বণিকরাজ মনুষ্য নন, দেবতা ! সামান্য মনুষ্য হইলে আজিকার বিপদে কি তাঁহাকে পরোপকারব্রতে দৃঢ়ব্রত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর দেখিতাম, না আপনাকে আপনি ভুলিয়া, জন্মাবচ্ছিন্ন সংস্কার হারাইয়া, উন্নতমন কুঞ্চিত করিয়া, জীবনলালসায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেখিতাম ? প্রকৃত নাটককার ধর্ম্মের অবতারণা করেন ; তাহার শক্তি, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব সকলই পাঠককে মনোহারিণী তুলিকা দিয়া আঁকিয়া দেখান ; সেই বিমুগ্ধকর চিত্রের দ্বারা পাঠকের মন মাতাইয়া তুলেন ; তুলিয়া আবার সেই চিত্রটিকে ভীষণান্ধকারে নিক্ষেপ করেন। সে অন্ধকারে ধর্ম্মের মুখ স্বভাবতই মলিন হইবার সম্ভাবনা, শক্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, মহত্ত্ব হীনত্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এই

ঘোর অবস্থাবিপর্য্যয় দেখিয়া পাঠকের মন আকুল হইয়া উঠে; প্রিয় বস্তুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পাঠকের মন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে; ধর্ম্ম নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করিতে বুঝি বা অপারগ হয় এই আশঙ্কায় পাঠকের হৃদয় বিলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে অন্ধকার সরিয়া যায়; দেখা যায় যে ধর্ম্মজ্যোতিঃ মলিন হয় নাই, যেমন উজ্জ্বল ছিল তেমনি উজ্জ্বল আছে; বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতে চিহ্নমাত্র অঙ্কিত করিতে পারে নাই। তখন পাঠকের মন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বুঝিয়া বর্দ্ধিতবল হয় এবং নির্ম্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় আনন্দে ভাসিতে থাকে। একেই আমরা বলি নাটকত্ব। সকল নাটকের কথা বলিতেছি না। নাটকের শ্রেণীবিশেষের কথা বলিতেছি। সেক্সপীয়রের Merchant of Venice এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নাটকত্ব কোথায় দেখা যাউক।

নাটক খানির নাম সত্ত্বেও আমাদের মতে অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি নায়ক-প্রধান নাটক। শকুন্তলা বড় কম নন; কিন্তু দুষ্মন্তই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রধান চরিত্র। দেখা যাউক এই দুষ্মন্ত কে। কোন একটি মনুষ্যের মন বুঝিতে হইলে অগ্রে তাহার শরীরটি বুঝিয়া দেখিতে হয়। মন এবং শরীর, এ দুইয়ে অতি নিকট সম্বন্ধ। মনের চিত্র শরীরে আঁকা থাকে। কালিদাস দুষ্মন্তকে ইন্দ্রিয়-শাসনাধীন করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের এবং শরীরের অনুরূপ কার্য্যানুরাগেরও একখানি চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। দ্বিতীয়

অঙ্কে দুষ্মন্তকে দেখিয়া তাঁহার সেনাপতি মনে মনে ভাবিতেছেন—

অনবরত ধনুর্জ্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥

দুষ্মন্ত-রাজা—ভারতের অতুলমহিমা-সম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন প্রখ্যাতনামা রাজা। তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। ঐশ্বর্য্যসুলভ বিলাস-রাশি মনে করিলেই তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাসবিদ্বেষী। তিনি বীরোচিত কার্য্যনিরত। তিনি শারীরিক সুখ তুচ্ছ করিয়া ধনুকহস্তে প্রচণ্ড রবিকিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। বিলাসীর ন্যায় তাঁহার দেহ জীবন-প্রভা-হীন শিথিলগ্রন্থি নয়। গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র বলব্যঞ্জক। এ ছবি অসার বিলাসপ্রিয় ব্যক্তির ছবি নয়। এ ছবি একজন পুরুষকারপূর্ণ মহাপুরুষের ছবি। আবার বিবেচনা করিতে হইবে যে, যখন সেনাপতি দুষ্মন্তকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহার শারীরিক বলবীর্য্যের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলারত্ন দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন, সেই পবিত্র রত্ন তাঁহার হইবে কি না। বিদূষক আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি পূর্ব্বরাত্রে নিমেষমাত্র নিদ্রালাভ করেন নাই। এবং আমরাও তাঁহাকে মুহূর্ত্তাগ্রে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি মনে

মনে তোলাপাড়া করিতেছেন, এবং আসিয়া প্রিয় বিদূষকের নালিশটি শুনিয়াও শুনিতেছেন না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সেনাপতি আসিয়া এই বিষম হৃদয়ব্যথার চিহ্নমাত্রও দুষ্মন্তের শরীরে বা মুখাবয়বে দেখিতে পাইলেন না। তবে ত দুষ্মন্ত শুধু কর্ম্মবীর নন। তবে ত তিনি কর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর দুইই। তিনি যে শুধু প্রচণ্ড রবিকিরণ সহ্য করিতে পারেন তা নয়; চিত্তসংযমও তাঁহার তেমনি অভ্যস্ত এবং স্বেচ্ছাধীন। ফলতঃ কালিদাস এই অদ্ভুত চিত্তসংযমের চিত্র অতিশয় জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠক! আইস, একবার মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখি। শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া আশ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন এবং কত কি কথা কহিতেছেন। দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া দেখিতেছেন এবং মুগ্ধ হইতেছেন। সর্ব্বলোকপ্রিয় ভ্রমরটী শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া, দুষ্মন্ত মনে মনে ভাবিতেছেন—

যতোযতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥
চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশোবেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকরহতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

এ বড় সহজ ভাব নয়। যে ভাবে ভোর হইলে মানুষ চিত্তসংযমে প্রায়ই বিফলযত্ন হয়, এ সেই ভাব। দুষ্মন্ত এখন সেই ভাবে ভোর। কিন্তু এখনি তাঁহাকে সেই সখী-ত্রয়ের সম্মুখীন হইতে হইল, এবং তাঁহাদের সুধাসিক্ত অনু-

রোধে তাঁহাদের কাছে বসিতে হইল। এমন অবস্থায় পড়িলে সে রকম ভাব ভরিয়া উঠে, না কমিয়া যায়? প্রিয়ম্বদা বলুক দুষ্মন্তের কি হইয়াছে—

> “হলা অনসূএ কোণুক্খু এসো দুরবগাহগম্ভীরাকিদী
> মন্থরং আলবন্তো পঁহুত্তদা ক্খিণং বিতথারেদি।

অসার বিলাসমগ্ন ব্যক্তির এ রকম অবস্থায় এ রকম প্রভাময় গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ মুখভাব হয় না। ধন্য দুষ্মন্তের চিত্তসংযম, ধন্য তাঁহার আত্মজয়! এখনও কিন্তু দেখিবার বাকি আছে। পাঠক! অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অঙ্কটি মনে কর। শকুন্তলা অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে সেই মহাপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনান্ত করিব। দুষ্মন্ত অনলপূর্ণ মনে এই সকল দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন। এত যাতনার পর মিলন হইল। কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ করিবার উদ্যমমাত্রে গুরুজন সমাগমাশঙ্কায় শকুন্তলাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। তখন দুষ্মন্তের কি অবস্থা? তখন তিনি প্রজ্বলিতান্তঃকরণে প্রতিনিঃশ্বাসে অনল শ্বাসিয়া ফেলিতেছেন। সহসা রাক্ষসপীড়িত তাপসগণের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়াই— “ভো ভো তপস্বিনঃ মাভৈষ্ট মাভৈষ্ট অয়মহমাগত এব—” এই আশ্বাসবাক্য স্থিরগম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে রাক্ষসবধে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যেন শকুন্তলার নামও শুনেন নাই! যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই! আশ্চর্য্য পুরুষ!

এই অদ্ভুত ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুষ্মন্তচরিত্রের প্রশস্তভিত্তি, অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভী-

রতা বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানই সেই অলৌকিক চরিত্রের মূলভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। ফলতঃ ধর্ম্মপালন এবং কর্ত্তব্যসাধনের কাছে দুষ্মন্তের বিবেচনায় কিছুই কিছু নয়—তিনি নিজেও কিছু নন তাঁহার শকুন্তলাও কিছু নয়। তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রতিনিঃশ্বাসে সুমিষ্ট মৃদুমন্দ মলয়বায়ুর ন্যায় নির্গত হয়। ঋষিগণের সন্তোষার্থ মৃগানুসরণে নিবৃত্ত হইয়া দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্মাকং।
অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি সর্ব্বত্র।"

অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং—তিনটি কি চারিটি বই কথা নয়; কিন্তু শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়! মনে হয় যেন আমরাই সেই শান্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। মনে হয় যেন সেই পবিত্র শান্তিময় তাপসাশ্রম এবং দুষ্মন্তের প্রশস্ত মন একই পদার্থ! আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সখীত্রয়কে দেখিলেন। তাঁহারা বল্কল-পরিধানা—মণিমুক্তাবিহীনা—মহামূল্য বস্ত্র এবং অঙ্গরাগবর্জ্জিতা। দুষ্মন্ত-রাজা; ভারতের মণিমাণিক্য সকলই তাঁহার; তাঁহার অন্তঃপুর মণিমাণিক্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। তিনি একবার মনে করিলেন, এ ঠিক্ হয় নাই। কিন্তু তখনই আবার ভাবিলেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীংতনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং॥

কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বল্কলং কান্তরূপং
ন মনসি রুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি।
বিকচসরসিজায়াঃ স্তোকনির্ম্মুক্তকণ্ঠং
নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালং॥

কি মনোহর ভাব! কিবা সুরুচিসঙ্গত কল্পনা! কি স্বাধীন ন্যায়পরায়ণ হৃদয়! সৌন্দর্য্য নিজেই সুন্দর—তাহার আবার পরিচ্ছদ পারিপাট্য কি? এ কথা কয়জনের মুখে শুনা যায়? এ কথা আর যে বলিতে পারে বলুক, কিন্তু ঐশ্বর্য্যমগ্ন মণি-মাণিক্যশোভিত রাজারাজড়ার মুখে এমন কথা শুনিতে পাওয়া বড় সম্ভব নয়। যে রাজা এমন কথা বলিতে পারে, সে রাজা অবস্থা এবং অভ্যাসের দাস নয়। তাহার চিত্ত স্বাধীন। দুষ্মন্ত একজন হিন্দুরাজা; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। আশ্রম প্রবেশকালে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হওয়ায় তিনি ভবিতব্যতার কথা মনে করিলেন। পরক্ষণে যাহা দেখিলেন এবং শুনিলেন তাহা সেই ভবিতব্যতার প্রতিপোষক। তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা তপস্বিনীর ন্যায় কাল কাটাইবেন না। তখন মনোধর্ম্ম * তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিল এবং ধর্ম্মসংস্কার মনোধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। তখন তাঁহার স্পৃহা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু সে স্পৃহা এখনও মিলন-স্পৃহারূপে পরিস্ফুট হয় নাই। কেবল সৌন্দর্য্য বোধেই তাহার পর্য্যাপ্তি। দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন—

---

* অনুরাগোৎপাদক বস্তু দেখিয়া মনে অনুরাগের সঞ্চার হওয়া অর্থে মনোধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিলাম।

"অবিতথ মাহ প্রিয়ম্বদা। তথাহ্যস্যাঃ—
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানু কারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

তার পরেই শুনিলেন শকুন্তলা সহকারাশ্রিতা কুসুমিতা নবমল্লিকাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

হলা রমণীও কৃখু কালো ইমস্‌স পাদবমিহুণস্‌স রদিঅরোসম্বুত্তো জেণ ণব কুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅংপি বহু ফলদাএ উঅভোঅক্খমো সহআরো।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গেল; রুচিতে রুচিতে মিলিয়া গেল; ভাবে ভাবে মিলিয়া গেল। কিন্তু একটি বিষয়ে মিল হইল না। শকুন্তলা নবমল্লিকার আশ্রয়লাভের কথা বলিয়াছিলেন; দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে সেটি এখনও বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন নাই। দুষ্ট প্রিয়ম্বদা সেই অভাবটি পুরাইয়া দিল। দুষ্মন্ত বুঝিলেন যে শকুন্তলা অভিলাষবতী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আহ্লাদে আটখানা না হইয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন বুঝি শকুন্তলা কণ্বদুহিতা—ব্রাহ্মণী, তাঁহার সহিত শকুন্তলার মিলন হইতে পারিবেক না। যেমন অভিলাষ বলবৎ হইয়া উঠিল অমনি ধার্ম্মিকের ধর্ম্মচিন্তা উদয় হইল। এইখানে মহাকবি জগদ্বিখ্যাত ভ্রমর-তাড়না ঘটনাটী সংযোজনা করিলেন। সে ঘটনাটীর অর্থ—মিলন, সম্ভোগ। অভিলাষীর মনকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে ইহার অপেক্ষা সুরুচিসঙ্গত অথচ বলবৎ কৌশল অবলম্বন করা যায় কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের বিচলিত মন আরো বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু

সেই সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার জাতি এবং উৎপত্তিবিষয়ক সন্দেহ আরো বলবৎ হইল। বোধ হয় দুষ্মন্তের ধর্ম্মানুরাগ এবং আত্মসংযম-শক্তি কম হইলে তিনি কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কায করিয়া ফেলিতেন। তার পর সকলের একত্রে বসিয়া কথোপকথন। তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার বৃত্তান্ত শুনিয়া সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়াছেন। প্রিয়ম্বদার মুখে কণ্বের অভিপ্রায় জানিয়া তিনি তখন সাহস পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় বুঝিয়াছে যে—

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

এমন সময় প্রিয়ম্বদার কথায় শকুন্তলা রাগ করিয়া, ‘সব বলিয়া দিব’ বলিয়া, গৌতমীর কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্তের হৃদয় আকুল হইয়া শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তখনি আবার সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—

অহো চেষ্টানুরূপিণী কামিজনচিত্তবৃত্তিঃ।

অহং হি।

অনুযাস্যন্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্বস্থানাদচলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার মন বুঝিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, শকুন্তলার উপর এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অধিকার জন্মে নাই। তিনি গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কে? তাঁহার হৃদয় ভয়ানক আবেগবান্ হইয়া উঠিয়াছে বটে। কিন্তু তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন—তিনি প্রকৃত উন্নতমনা—তিনি

ধর্ম্মবীর। তাঁহার হৃদয়ের বল্গা তাঁহারই হাতে। সে হৃদয়ের অশিষ্ট উদ্যম সেই হৃদয়েই নিঃশেষিত হইয়া গেল।

তার পর বিদূষকের সহিত কথা। সে কালের বিদূষক সে কালের রাজাদের 'ইয়ার'। রাজাদিগকে সর্ব্বদাই রাজ-ঠাটে থাকিতে হইত; মনের কথা সকলের কাছে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বিদূষকের কাছে ঠাট ভাট থাকিত না; মনের কথা মন খুলিয়া বলিতেন। মাধব্য দুষ্মন্তকে যেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

ভো অঈসা তবস্মিকণ্ণয়া অণর্ব্ভত্থণীয়া
তা কিং তাএ দিট্‌ঠআএ।

অমনি দুষ্মন্ত যেন বিষধর-দংশিতের ন্যায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ধিঙ্মূর্খ !
নিবারিত নিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি ॥
ন চ পরিহার্য্যে বস্তুনি দুষ্মন্তস্য মনঃ প্রবর্ত্ততে ॥

তার পর রাজা পূর্ব্বদিনের সকল কথা মাধব্যকে বলিলেন। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি, মাধব্য, কি অছিলা করিয়া সেই আশ্রমে যাই। মাধব্য বলিলেন কেন, আমার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ চাই, এই বলিয়া যাও। দুষ্মন্ত রুদ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

মূর্খ ! অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো
মে নির্ব্বপন্তি যো রত্নরাশীনপি বিহায়াঽভিনন্দ্যতে। পশ্য—
যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥

কি গম্ভীর, কি দুর্জ্জয় ধর্ম্মভাব! কি মনোহর ধর্ম্মানুরাগ! যে শকুন্তলার নিমিত্ত হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সে শকুন্তলাও এই ধর্ম্মানুরাগের কাছে কিছুই নয়! শকুন্তলা যতই কেন প্রিয় হউন না, তা বলিয়া কি ধর্ম্মকে প্রেমের কুটিল-কৌশলে পরিণত করিয়া ঘৃণাস্পদ করিতে হইবেক? বিদূষকের কাছেও এ কথা বলিতে দুষ্মন্তের ঘৃণা হয়!

তার পর কয়েকজন তপস্বী দুষ্মন্তের নিকট আসিয়া রাক্ষসকৃত আশ্রমপীড়ার সম্বাদ দিলেন। দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া রথসজ্জা করিবার আজ্ঞা দিলেন; রথ সজ্জিত হইল। এমন সময়ে রাজধানী হইতে মাতৃআজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারই কল্যাণার্থ রাজমাতা ব্রত করিবেন, অতএব তাঁহাকে যাইতে হইবেক। দুষ্মন্ত সঙ্কটে পড়িলেন। ঋষিগণও যেমন মাননীয়, রাজমাতাও তেমনি মাননীয়া। “ইতস্তপস্বিনাং কার্য্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উভয়মনতিক্রমণীয়ং।” তিনি জানিতেন যে রাজমাতা মাধব্যকে বরাবর পুত্রবৎ ভালবাসেন। অতএব স্নেহ এবং ভক্তিপূর্ণ মনে মাধব্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কবি একটি কৌশলে তাঁহার আখ্যায়িকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিলেন এবং তাঁহার দুষ্মন্ত যে কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ নন, তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়া দিলেন।

দুষ্মন্ত-রাজা। কিন্তু কালিদাস কি তাঁহার রাজকার্য্যের কথা কিছুই বলেন নাই? সে কথাটি না জানিলে ত কিছুই জানা হইল না। তিনি মুনিঋষিকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন; পিতামাতার ন্যায় গুরুজনকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন;

তিনি চিত্তসংযমে অমিতবল ; ধর্ম্মসেবায় একাগ্রচিত্ত ; প্রণয়ে বিশুদ্ধমনা ; শত্রুনাশে অসীমবিক্রম ; শরীরপালনে কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে কিরূপ ? কালিদাস তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে বলিয়াছেন সেটি কি চমৎকার ! কঞ্চুকী পার্ব্বতায়ন, অক্ষয়নামা মিবার-মন্ত্রী ভামাশার ন্যায়, রাজসরকারে থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন। যে যষ্টি যৌবনে কেবল তাঁহার উচ্চ পদবীর চিহ্নস্বরূপ ছিল, সেই যষ্টি এখন তাঁহার অন্ধের নড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে এখন তিনি পাদচারে অক্ষম। তিনি যে শুধু দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন এমত নয়। দুষ্মন্তের পিতা, পিতামহ, হয় ত প্রপিতামহকেও দেখিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার কাছে 'কালিকার ছেলে' বই নয়। শার্ঙ্গরব প্রভৃতি রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ বহুদর্শী কঞ্চুকী ভাবিতেছেন,—যে প্রজাবৎসল নরপতি রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া এইমাত্র অবকাশলাভ করিলেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এখনি ঋষিকুমারদিগের আগমনসম্বাদ দিব। কি স্নেহ ! পিতাও সন্তানের ক্লেশে এতদূর কাতরতা প্রকাশ করেন কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের প্রজাপালনকার্য্যানুরাগের ইহার অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ পাওয়া কঠিন। কিন্তু কবি তাহা ও দিয়াছেন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী একবার মাত্র স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পরক্ষণেই সুদৃঢ়চিত্তে বলিতেছেন—

"অথবা কুতোবিশ্রামোলোকপালানাং।"

তিনি কি রকম রাজা যাঁহার কর্ম্মচারীর এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এত রাজনীতিপ্রিয়তা—এত সাহস ও দৃঢ়তাপূর্ণ মন ?

কঞ্চুকী, তুমি যথার্থই অনুপম রাজার অনুপম কর্ম্মচারী বৃদ্ধবর! তুমি দুষ্মন্তকে 'কচি ছেলে' বলিয়া 'মাফ' করিবার লোক নহ। তুমি যখন দুষ্মন্তকে এত ভালবাস, তখন দুষ্মন্ত যথার্থই সমস্ত জগতের ভালবাসার পাত্র এবং পৃথিবীর রাজাদিগের আদর্শস্থল।

দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শকুন্তলা দুর্ব্বাসাকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলেন। অবশিষ্ট আখ্যায়িকাকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবেক। শাপোচ্চারণ হইতে অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত একভাগ; অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি হইতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্ম্মিলন পর্য্যন্ত আর একভাগ। কি জন্য এইরূপ ভাগ করিতে হইল, পরে বুঝা যাইবে।

দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন যে দুষ্মন্ত-প্রদত্ত নিদর্শনটি দেখিলে তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না। শকুন্তলা সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু জানেন না যে হারাইয়াছেন। এ ঘটনার যে কি চমৎকার অর্থ তাহা পরে বলিব, এখন নয়*। অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া শকুন্তলা তাঁহার পবিত্র বিশ্ববিমোহন রূপরাশি লইয়া দুষ্মন্তের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পাঠক! তোমাকে এইখানে একবার সেই বল্কলপরিধানা, কুসুমিতযৌবনা, পবিত্রনয়না, লতামৃগানুরাগিণী, আশ্রমবাসিনী তাপসবালার রূপরাশি মনে করিতে হইবেক। যে রূপরাশি দেখিয়া ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত সে দিন দুর্নিবারশরবিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই রূপরাশি একবার

---

* চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখ।

মনে করিতে হইবেক। সেই রূপরাশি এখনও সেই দুষ্মন্তের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছে।

> "অয়ে অত্র।
> কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
> মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥"

তবে কেন তিনি এখন সেই রূপরাশিসম্পন্না শকুন্তলাকে অস্পৃশ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? শাপপ্রভাবে তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু যে চক্ষু সেদিন শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আজও ত তাঁহার সেই চক্ষু, সেই মন রহিয়াছে। তবে কেন আজ শকুন্তলা তাঁহার কাছে কৌশলকুটিলা অস্পৃশ্যা কলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন? কৈ, সেখানে আর যাহারা আছে তাহারা ত অবিচলিতচিত্ত নয়। প্রতীহারী শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপরাশি দেখিয়া ভাবিতেছে—

> অম্মো ধম্মাবেক্‌খিণো ভট্টিণো ঈদিসং
> নাম সুহেবণদং ইত্থিআরঅণং
> পেক্‌খিঅ কো অন্নো বিআরেদি।

দুষ্মন্তও সে রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ—

> ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
> প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যাধ্যবস্যন্।
> ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
> ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্।

কিন্তু তাঁহার মনে হইল না যে শকুন্তলা তাঁহার। তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত ফণিনীর ন্যায় বিষময় বাক্যে

তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিলেন; তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঋষিকুমার শার্ঙ্গরব তাঁহার উপর শাপাগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিকোপানল যে কি ভয়ানক পদার্থ দুষ্মন্ত তাহা বিলক্ষণ জানেন। তিনি নিজেই সেদিন মাধব্যকে বলিয়াছেন—

> শমপ্রধানেষু তপোবনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
> স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তাস্তে হ্যন্য তেজোঽভিভবাদ্দহন্তি॥

আজ সেই গূঢ়নিহিতানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে আসিতেছে। কিন্তু আজ তিনি সে কোপানলকে ভয় করিতেছেন না। কেন, তিনি কি আর সে দুষ্মন্ত নন? তাঁহার চিরাভ্যস্ত গুরুজনগত ভীতিসম্ভ্রম সকলই কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তা নয়। সে সকলই তাঁহার আছে; কিন্তু গুরুজন আজ তাঁহাকে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতে বলিতেছেন। গুরুজন আজ তাঁহাকে পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মবীর; তিনি ভাবিতেছেন, যেখানে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সেখানে ভুবনমোহিনী রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিপ্রভ মহা ঋষিও তুচ্ছ। কি ধর্ম্মানুরাগ! কি চিত্তসংযম! অতুল রূপরাশি তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। লইলে, কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না। দূষিতচিত্ত হইলে তিনিও লইতেন। প্রতীহারী যথার্থই বলিয়াছিল—

> অম্মো ধম্মাবেক্খিণো ভট্টিণো ঈদিসং নাম সুহোপনদং
> ইত্থিআরঅণং পেক্খিঅ কো অণ্ণো বিআরেদি।

দুষ্মন্তের প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইলেন। রূপ দেখিয়া তিনি রূপজ মোহ অনুভব করিলেন; কিন্তু সে মোহ তাঁহার মানসিক শক্তিকে পরাজয়

করিয়া তাঁহাকে মোহমুগ্ধের ন্যায় কার্য্য করাইতে পারিল না। তিনি বাহ্য জগতের উপর বিজয়ী হইলেন। সেই জয়ে কবিরও জয়। কালিদাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি দেখাইলেন যে ধর্ম্মের কাছে ভারতের ঋষিতপস্বীও কিছু নয়! কালিদাস, তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও—তুমি জগতের ব্রাহ্মণ!

দুষ্মন্ত পুনরায় নিদর্শনাঙ্গুরীয়কটী দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তখন আর একপ্রকার পরীক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু এ পরীক্ষাও বড় সহজ পরীক্ষা নয়। শকুন্তলার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে রকম নিষ্ঠুরভাবে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার শান্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অনুতাপানলে সন্তপ্ত। আমোদ আহ্লাদ আর তাঁহাকে ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কঞ্চুকীর ন্যায় রাজভক্ত রাজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতিও যেন অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ কঞ্চুকী যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

রম্যং দ্বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনম্রশ্চিরম্॥

ভাবিয়া ভাবিয়া দুষ্মন্তের শরীর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার প্রভাময় গম্ভীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; তাঁহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয় দুষ্মন্ত আর সে দুষ্মন্ত নাই! সেই পবিত্র আশ্রমে দুষ্মন্ত যেমন তাঁহার শকুন্তলার যন্ত্রণাদগ্ধ দেহখানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আজ বৃদ্ধ কঞ্চুকী দুষ্মন্তের অনুতাপদগ্ধ দেহস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় কাতর মনে ঠিক তেমনি বলিতেছেন—

প্রত্যাদিষ্ট বিশেষমণ্ডনবিধি বামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণ প্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণেঽপি নালক্ষ্যতে॥

এই শোচনীয় অবস্থায় আজ দুষ্মন্ত রাজোদ্যানে গভীর চিন্তানিমগ্ন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। কিন্তু আজ পুরুবংশের দুর্দ্দিন দেখিয়া, অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্দ্দিন দেখিয়া, ভীতি-বাৎসল্যপূর্ণ মনে তিনি ভাবিতেছেন—বুঝি একটু ‘খেলাধূলা’ করিলে দুষ্মন্ত কিছু ‘আনমনা’ হইবেন। এই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ব্যায়ামভূমিতে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অশীতিবর্ষীয় পলিতকেশ কুলকর্ম্মচারীর মুখে এ রকম কথা শুনিলে, বিরহকাতর যুবা পুরুষের কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয় সেই জন্য বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে কিছু না বলিয়া দুষ্মন্ত বেত্রবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

বেত্রবতি! মদ্‌বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিত

মম্মাভিধর্ম্মাসন মধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিত মার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

এত যাতনায়, এত সন্তাপেও দুষ্মন্ত রাজকার্য্য ভুলেন নাই। এত ক্লিষ্ট মনেও তাঁহার বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা কত বলবতী! এত অনলদগ্ধ হইয়াও দুষ্মন্ত ভস্মাবশেষ হন নাই!

তার পর সেই মন-প্রাণহারী চিত্র-দর্শন। চিত্র দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে তাঁহার জীবনময়ী-শকুন্তলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিত্রিত ভ্রমরটীকে সেই আশ্রমদৃষ্ট ভ্রমর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্থানজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে বেত্রবতী আসিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যের সম্বাদ দিল। অমনি, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, এইরূপ স্থিরগম্ভীর ভাবে তিনি কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রধানামাত্যের ভ্রমসংশোধন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বিচার করিয়া দিলেন। শুধু তা নয়। সেই অপুত্রক মৃত বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নিরুপণোপলক্ষে তিনি সমস্ত প্রজাগণের মঙ্গলার্থ স্নেহবান্ পিতার ন্যায় এই স্নেহপূর্ণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাষাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্।

আজ্ঞা লইয়া বেত্রবতী চলিয়া গেল। তখন দুষ্মন্তের অপুত্রকাবস্থা স্মরণ হইল। স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দুষ্মন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং

ধর্ম্মভীরু। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের কথা মনে পড়িল তাঁহাদের পবিত্রাত্মার শোচনীয় পরিণাম মনে হইল। তি যন্ত্রণাবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন অসহ্য শকুন্তলাচিন্তাও সেই গিরিচরগজবৎ বলসার দেহস্তম্ভ ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই! এই পতনেই দুষ্মন্তে দুষ্মন্তত্ব দেদীপ্যমান্!

মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া আছেন এমন সময় বিপন্নের ভয়ার্ত্ত রব শ্রুত হইল। অমনি কর্ম্মবীর দুষ্মন্ত শশব্যস্ত হইয় উঠিলেন। আর তাঁহার শকুন্তলাচিন্তা নাই। আর তাঁহা শকুন্তলাচিন্তাজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতাও নাই। এখ তিনি যে দুষ্মন্ত সেই দুষ্মন্ত! বিপরীত-বিক্রম সহকারে তিনি ধনুর্ব্বাণ সাপটিয়া লইলেন। নিমেষমধ্যে সকল কথা অবগত হইয়া দেবতাদিগের সাহায্যার্থ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অসুরনাশে শূন্যপথে উঠিলেন।

পাঠক, একবার ভাবিয়া দেখ, এখন দুষ্মন্তের কি ভয়ানক অবস্থা! তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি অবিচার, কি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বুঝিতেছেন। তাহাতে আবার জানেন যে সেই নিরপরাধা এখন মর্ত্ত্যলোকে নাই। আর যে কখন তাঁহাকে পাইবেন, সে আশাও এখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, এবং সেই জন্যই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পরিণাম ভাবিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছেন। এখন তিনি শুধু অনুতাপদগ্ধ নন। যে আশার বলে লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, সে আশাও তাঁহাকে একেবারে পরি-

ত্যাগ করিয়াছে। মহাকবি মিল্টন নরকবর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে সেখানে—

> "Hope never comes that comes to all,
> But torture without end."

এখন দুষ্মন্তের হৃদয়ও আশাশূন্য অনন্তযন্ত্রণাগার! কিন্তু অসুরবধে আহূত হইবা মাত্র তাঁহার সে সকলই যেন কোথায় কি হইয়া গেল। তখন তিনি আগ্রহাতিশয়সহকারে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। করিয়া বিদূষককে বলিলেন—

> "বয়স্য অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা তদ্গচ্ছ পরিগতার্থং
> কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি।
> ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ প্রতিপালয়তু প্রজাঃ।
> অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ॥"

বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুষ্মন্ত নিজের সুখ দুঃখ সকলই ভুলিতে পারেন, কিন্তু যে কোটি কোটি হৃদয়ের সুখ দুঃখ অনতিক্রমণীয় নিয়তির বলে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের সুখ দুঃখ ভুলিতে তিনি নিতান্তই অক্ষম। মহাকবি দুষ্মন্তকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মহাপরীক্ষায় প্রবিষ্ট করিয়া অতুলজ্যোতিঃ দেবতার ন্যায় উত্তীর্ণ করাইলেন! পরীক্ষার পূর্ব্বে আমরা যে দুষ্মন্ত দেখিয়াছিলাম, পরীক্ষার পরেও সেই দুষ্মন্ত দেখিলাম। পরীক্ষায় দুষ্মন্তের দুষ্মন্তত্ব বিলুপ্ত না হইয়া মেঘমুক্ত রবির ন্যায় বর্দ্ধিত গৌরবে প্রকাশ পাইল। যে বাহ্য-জগৎ-অনুশাসক মন নাটকে চিত্রিত হয়—যে অন্তর্ভিত্তি-মূলক চরিত্র সকল অবস্থাতেই সমান থাকে বলিয়া নাটককার অর্থাৎ মনের ইতিবেত্তা আঁকিয়া থাকেন, অভি-

জ্ঞানশকুন্তলে সেই মন এবং সেই চরিত্র দেখিলাম। তাহা এই নাটকের নাটকত্ব। কিন্তু যাহা দেখা হইল তাহা অতি সামান্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুষ্মন্ত—নাটকের চরিত্র।

অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে দুই রকম নাটকত্ব থাকে। একরকম নাটকত্ব প্রত্যক্ষ—নাটকের আখ্যায়িকা পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায়। আর একরকম নাটকত্ব অপ্রত্যক্ষ—নাটক পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বুঝিতে পারা যায় না—বুঝিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ নাটকত্ব নাটকের কায়াতে আঁকা থাকে—দেখিতে ইচ্ছা কর আর নাই কর, নাটক পড়িতে গেলে দেখিতেই হইবেক। অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব নাটকের গায়ে আঁকা থাকে না—ইচ্ছা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইচ্ছা করিয়া যুক্তিদ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হয়। সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট নামক নাটক পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবরাজ হ্যামলেটের মন তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্যের সম্বন্ধে রোষপূর্ণ, ঘৃণাপূর্ণ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধবাসনাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিশোধসাধনে অদৃঢ়-

সঙ্কল্প—পিতৃব্যপ্রাণসংহারে অনিশ্চিতহস্ত। নাটকখানি প্রথম হইতে শেস পর্য্যন্ত এই দ্বিভাবাঙ্কিত। শেষ পর্য্যন্ত যুবরাজ হ্যামলেট পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিবার জন্য ভয়ানক আবেগবান্, কিন্তু প্রাণসংহার করেন করেন করিয়াও করিতে পারেন না। এইটি হ্যামলেট নাটকের প্রত্যক্ষ নাটকত্ব—নাটকখানি পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়—পড়িয়া গেলেই চোকে পড়ে। কিন্তু এই নাটকত্বের অন্তরালে আর একটি নাটকত্ব আছে—এই দ্বিভাবের মূলে একটি দ্বিভাবোৎপাদক মানবপ্রকৃতি আছে। যে বিশেষ মানসপ্রকৃতির বলে, যে বিশেষ মনোগঠনপ্রণালীর গুণে কার্য্যক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের মধ্যে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই হ্যামলেট নাটকের গূঢ় বা অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব। এই গূঢ় বা অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব প্রত্যক্ষ নাটকত্বের কারণস্বরূপ। প্রত্যক্ষ নাটকত্বের ন্যায় ইহাকে নাটকের গায়ে পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় না—গূঢ়নিহিত বলিয়া ইহাকে খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে ও ঠিক্ তাই। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি তাহা ইহার প্রত্যক্ষ নাটকত্ব। সেই নাটকত্বের মূলে যে গূঢ় অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব আছে এখন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে আমরা দুষ্মন্তসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সার মর্ম্ম বুঝিয়া দেখিতে হইবেক। একটি অসামান্য-রূপ-লাবণ্যসম্পন্না বালিকার সহিত প্রণয় করিতে গিয়া দুষ্মন্তের মহাপরীক্ষা হইয়া গেল। এ কিসের পরীক্ষা? এ কি দুষ্মন্তের প্রণয়ের পরীক্ষা? বোধ হয় অনেকে বলিবেন—

হাঁ তাই। অনেকে বলিবেন যে দুষ্মন্ত জনশূন্য তপোব একটি স্বল্পবয়স্কা, সরলমনা, রাজমাহাত্মমুগ্ধা তাপসবালা দেখিয়া প্রণয় করিয়াছেন বলিয়া পাছে কেহ কিছু মনে ক সেই জন্য মহাকবি পরীক্ষাদ্বারা দেখাইলেন যে সে প্রণ পবিত্র। এ কথার একটি উত্তর এই যে, কালিদাসের ন্যা প্রথমশ্রেণীর কবিগণ দূষিত প্রণয় লইয়া কাব্য বা নাট লেখেন না। * দ্বিতীয় উত্তর এই যে, জলসেচনকার্য্যনিরত শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণসম্বন্ধে দুষ্মন্ত যেরূপ সন্দেহসংক্ষুব্ধ হন, তাহাতেই সপ্রমাণ দুষ্মন্ত দূষিতান্তঃকরণে শকুন্তলার সহিত প্রণয় করিতে বসেন নাই। তৃতীয় উত্তর এই যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দিয়া যান। চতুর্থ উত্তর এই যে, উপ-

---

* সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ সমালোচক Dr. Ulrici সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট নামক নাটকসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন :—

"That the leading interest of this drama is centered in the loves of Romeo and Juliet, is clear even to a child. Still I cannot persuade myself that the meaning of the whole piece is exhausted in the deification and entombment of love, and that this idea constitutes the groundwork of the play. On the contrary, Shakspeare can scarcely have designed to deify love merely as an inexpressible feeling—an intoxicating passion. That were, indeed, an idolatry of which art could never be guilty, even though, like the African with his Fetish, it should destroy its idol with its own hand."

Dr. Ulrici প্রণীত Shakspeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠা।

ন্যাসের প্রারম্ভেই কবি দুষ্মন্তকে যেরূপ শান্ত এবং পবিত্র মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা সমর্থন করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা এইটুকু স্বীকার করি যে এই পরীক্ষায় গাঢ় পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।) মনুষ্যহৃদয়ের প্রকৃতিপ্রকটন করা নাটকমাত্রেরই উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে শুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য মহাকবি দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে প্রকৃতি বুঝাইতে হইলে নাটক না লিখিলেও চলে। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি লংফেলোর Evangeline নামক ঔপন্যাসিক কাব্য এই কথার একটি প্রমাণ। দুষ্মন্তের মহাপরীক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণাময় হইয়াছিল। কিন্তু পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়া কোন্ নৈতিক নিয়মে যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়? অতএব পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি দেখাইবার জন্য যন্ত্রণাময় পরীক্ষা হইল, এ কথা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত।

তবে এ পরীক্ষা কিসের পরীক্ষা? প্রশ্নটী বড় গুরুতর। অতএব কিঞ্চিৎ বাহুল্যব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম পরিচ্ছেদে দুষ্মন্তের প্রণয়োপাখ্যান যে রকম বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। আমরা দেখি যে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণাময়। দুষ্মন্ত প্রেমে উত্তেজিত হইবামাত্রই প্রেমানুভবের সুখাস্বাদনে অক্ষম। যে দণ্ডে দুষ্মন্তের হৃদয় প্রেমবিহ্বল, সেই দণ্ডেই দুষ্মন্তের মন ধর্ম্ম ভয়ে ভীত। প্রেম কি? না শারীরিক

বিকারযুক্ত হৃদয়ের ভাববিশেষ। প্রেম একটি তামসিক রাগ অর্থাৎ passion। ধর্ম্মভয় জ্ঞানমূলক। সকলেই জানেন যে জ্ঞান এবং রাগ প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বলেন যে sensation and preception bear an inverse ratio to each other। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক আছে তাহা দেখিতে পান না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখেন। ইহাতেই এক রকম বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়ক রাগ বা ভাবের শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট; কালিদাসের নায়ক রাগের শাসনেও জ্ঞানের শাসনাধীন। ইহাতে বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়কের মনে তাঁহার রাগের বিরোধী কিছুই নাই; কালিদাসের নায়কের মনে তাঁহার রাগের বিরোধী জ্ঞান এবং জ্ঞানমূলক ধর্ম্মভয় আছে। তাই বলিতেছিলাম যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সেক্সপীয়রের নায়কের প্রেমের বিঘ্ন বাহ্যবস্তুসম্ভূত—মণ্টেগিউ এবং কেপুলেট বংশদ্বয়ের চিরশত্রুতাজনিত। কালিদাসের নায়কের প্রেমে বাহ্যকারণসম্ভূত বিঘ্ন কিছুই নাই। দুষ্মন্ত দেখিতেছেন, শকুন্তলার হৃদয়ানুলিপ্তা সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া, শকুন্তলার বিবাহের ঘটকালীতে নিযুক্ত। তিনি বুদ্ধিমান্ — বুঝিতেছেন যে আশ্রমের অধিনায়িকা গৌতমী সব জানিয়াও ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান্

কণ্ব কেবল উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় আছেন। বস্তুতই দুষ্মন্তের প্রেমের একমাত্র বিঘ্ন দুষ্মন্তের অন্তর্জগতের জ্ঞানমূলক ধর্ম্মভাব।

তার পর আমরা দেখি যে যখনই দুষ্মন্ত শকুন্তলাভাবে ভোর তখনই মহাকবি তাঁহাকে সেই ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা দেখি যে যখনই দুষ্মন্ত মোহাভিভূত, তখনই মহাকবি তাঁহাকে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। সকলেই জানেন যে যেখানে মোহাধিক্য সেখানে কার্য্যশক্তির নাশ—সেখানে মনুষ্য প্রায় উদ্যমহীন। একবারমাত্র শকুন্তলাকে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুষ্মন্ত লালায়িত হইয়াছেন। হইয়া ঋষিদিগের আহ্বানে পুনর্দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় রাজমাতার নিকট হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ আত্মভাব এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ উপস্থিত। ইহার তাৎপর্য্য কি? বলা অনাবশ্যক যে শুধু মাধব্যকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কবি এইরূপ ঘটনাকৌশল অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক যে এই আত্মভাব এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আত্মেতর ভাবের প্রবলতাই উপলব্ধি হয়। প্রেমশক্তি অপেক্ষা মাতৃস্নেহ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বলিব যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা?

আবার যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়াও না পাইয়া

প্রজ্বলিতচুল্লীর ন্যায় প্রেমানল উদ্গার করিতেছেন, তখনই মহাকবি তাঁহাকে বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণ করাইলেন। আবার সেই আত্মভাব এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ। এবং আবার সেই রকম আত্মভাবের লয় হইয়া আত্মেতর ভাবের ঘোরতর উদ্রেক। আবার সেই রকম প্রেমশক্তির প্রবলতা প্রদর্শিত না হইয়া সামাজিক স্নেহের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা প্রদর্শিত হইল।

আর বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বপ্রস্তাবটী স্মরণ করিলেই অবশিষ্ট এবম্বিধ ঘটনাগুলির অর্থগুরুত্ব এবং ভাবগাম্ভীর্য্য অনুভূত হইবেক।

এখন বলা যাইতে পারে যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা নয়, তাঁহার জ্ঞান এবং সৎপ্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মভাব এবং অনাত্মপরতার পরীক্ষা। বিনা পরীক্ষায়, বিনা সংঘর্ষে অগ্নি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কে না জানে যে সেই বিষম চিত্রদর্শনের পর ভূপতিত বিহ্বলহৃদয় বিহ্বলজ্ঞান দুষ্মন্ত যখন বিপন্নের আর্ত্তনাদ শুনিয়া বীরবিক্রমে ধনুর্ব্বাণ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন বোধ হইল যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উঠিল! তবে দুষ্মন্তের মনের সংঘর্ষ কিসের সংঘর্ষ হইতে পারে? আমাদের বোধ হয় সে সংঘর্ষ সেই মনের আত্মভাবের এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ—সেই মনের আত্মপরতার এবং সমাজপরতার সংঘর্ষ—সেই মনের একঅংশের সহিত আর একঅংশের সংঘর্ষ। সেক্সপীয়রের সর্ব্বপ্রধান প্রেমতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক, রোমিও এবং জুলিয়েট, এ রকমের নয়। রোমিওর মনের

সংঘর্ষের কারণ দুইটি বংশের চিরশক্রতা—বাহ্যজগৎমূলক। রোমিওতে, এক দিকে একটি রিপূন্মত্ত মন, আর একদিকে বাহ্য বা জড়জগৎ। দুষ্মন্তে, মনের একদিকে একটি রিপূন্মত্ততা আর একদিকে বাকি সমস্ত মনটা। দুইটি পরীক্ষার প্রণালী দুই রকম। কোন্ প্রণালীটী উৎকৃষ্ট, পরে বলিব *।

আমরা দেখিলাম যে দুষ্মন্ত একটি আত্মেতরভাব বা সামাজিকভাব-প্রধান চরিত্র। যেখানেই দুষ্মন্তের মনের আত্মভাবের এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ সেইখানেই তাঁহার আত্মেতর ভাব বিজয়ী। যেখানেই আত্মসম্ভোগ এবং সামাজিক ধর্ম্মের বিরোধ সেইখানেই দুষ্মন্তের সামাজিকধর্ম্ম প্রবলতর। ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত নাটকত্বের সার মর্ম্ম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সেই সামাজিক-ধর্ম্মভাবের প্রকৃতিটী বুঝিয়া দেখিতে হইবেক।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের সামাজিক প্রকৃতি দুইপ্রকার—একটি ভাবমূলক, আর একটি জ্ঞান বা যুক্তিমূলক। সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম, সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে জগতের কতকগুলি লোক নিজের যুক্তিশক্তি প্রয়োগ না করিয়া পরের মতাবলম্বী হইয়া চলেন; আর কতকগুলি লোক পরের মতানুসরণ না করিয়া নিজের যুক্তিশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরের মতানুসরণ করিয়া সংসারধর্ম্ম করা মোহের কার্য্য। সে মোহ শ্রদ্ধাতিশয়মূলক। ভারতে এ

---

* পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ।

পর্য্যন্ত এই মোহমূলক সমাজপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। এই প্রাণিসঙ্কুল লোকসাগরতুল্য ভারতভূমিতে অতি পূর্ব্বকাল হইতে ব্রাহ্মণবাক্যই সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মের এক মাত্র সূত্র—একমাত্র নিয়ামক। এখানে ধর্ম্মাচার্য্য যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম বলিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এখানে ধর্ম্মাচার্য্য যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে অধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। উন্নতিশীল ইউরোপেও এই দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে। দুই কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত ইউরোপবাসী ভারতের প্রণালীতে সংসারধর্ম্ম করিত—রোমানক্যাথলিক পুরোহিতগণের বাক্যই সমস্ত ইউরোপে একমাত্র ধর্ম্মসূত্র, একমাত্র ধর্ম্মনিয়ামক ছিল। এখনও অর্দ্ধাধিক ইউরোপবাসীর মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। এই মানবপ্রকৃতি-রহস্যের মূল কি ? আমাদের বোধ হয় ইহার একটি মূল মনুষ্যমনের একরকম স্বাভাবিক অলসপ্রিয়তা—অনুসন্ধান করিবার শ্রমকাতরতাজনিত ইচ্ছাশক্তি বা will power এর খর্ব্বতা। আর একটি মূল, চিরদৃষ্ট উৎকৃষ্টতার সম্বন্ধে মনুষ্যমনের শ্রদ্ধার ভাব। ভাল জিনিস প্রাচীন হইলে অনেকে স্বভাবতই তাহাতে সম্ভ্রমের সহিত আসক্ত হয়। সে আসক্তি একটি মোহের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে মোহে অর্দ্ধাধিক জগৎ মুগ্ধ। সে মোহ খণ্ডন করা একরকম অসাধ্য বলিলেই হয়। আর কতকগুলি লোক যুক্তিদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মোহে

মুগ্ধ নন ! তাঁহারা প্রাচীন মত, প্রাচীন পদ্ধতি, প্রাচীন বস্তুকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এটিও মনুষ্যমনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির বলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব; ভারতে বুদ্ধদেবের সমাজসংস্কার। এই দুইটি মানবপ্রকৃতির কোনটিই পরিত্যজ্য নয়। কিন্তু দুইটি একত্রীভূত না হইলে সমাজের বিষম অমঙ্গল ঘটে। সমাজ হয় ভারতের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া উন্নতিসাধনে এককালে অক্ষম হইয়া উঠে,নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ন্যায় অনন্তবিপ্লবাবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে। মনুষ্যজাতির এই দুইটি প্রকৃতিরই আবশ্যক। এবং মনুষ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায় যে মনুষ্যজাতি সততই এই দুইটি প্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধনের দিকে ধাবমান। ইউরোপে এবং এশীয়ায় মধ্যে মধ্যে যে সকল তুমুল সমাজবিপ্লব এবং ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহা মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহার বলবৎ সাক্ষী। কালিদাসের দুষ্মন্ত এই সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহারূপ মানবপ্রকৃতির প্রতিকৃতি। দুষ্মন্তে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। সেইটি বুঝাইতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রে দুষ্মন্তের অগাধ ভক্তি। তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল, তিনি ভাবিলেন—

> "অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্থ।
> অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি সর্ব্বত্র।"

এ ভক্তি বড় কম ভক্তি নয়। আমরা এ রকম ভক্তিকে কুসংস্কার বলি। আমরা এইরূপ বুঝি যে পৌরোহিত্বের

মোহে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানভ্রষ্ট না হইলে এরকম ভক্তি মনে স্থান পায় না।

দুষ্মন্ত এমন বিশ্বাস করেন যে অন্যে যাগযজ্ঞ করিলে, তিনি তাহার ফলভাগী হইতে পারিবেন। তিনি বলেন—
"অন্যমেব ভাগধেয় মেতে তপস্বিনো মে নির্ব্বপন্তি।"

দুষ্মন্ত প্রচলিত প্রথার পক্ষপাতী। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর কাছে শাঙ্গ´রব প্রভৃতির আগমনবর্ত্তা পাইয়া তিনি বলিতেছেন—

> তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্বচনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ, অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপ্যেতাং তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

দুষ্মন্ত হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মকাণ্ড মানিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহে পবিত্র আহবানীয়াগ্নি সযত্নে রক্ষিত—

> রাজা। উত্থায়। বেত্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

দুষ্মন্ত মনে করেন যে ভারতের মুনিঋষিগণ দেবতুল্য। তিনি মুনিঋষিকে দেবতানির্ব্বিশেষে ভয় করেন, ভালবাসেন এবং সম্ভ্রম করেন। তিনি জানেন যে—

> শমপ্রধানেষু তপোবনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
> স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তা স্তে হ্যন্য তেজোঽভিভবাদ্দহন্তি॥

পাঠক বোধ হয় সহজেই স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তির মনের বিশ্বাস এইরূপ, সে ব্যক্তি পৌরোহিত্যকুহকে অভিভূত। পাঠক বোধ হয় বলিবেন, যে ব্যক্তির মনের ভাব এই রকম, সে ব্যক্তি ইউরোপের 'মধ্যযুগের' ন্যায় পৌরোহিত্যপ্রধান যুগের লোক বই উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় জ্ঞানপ্রধান যুগের লোক হইতে পারে না।

দুষ্মন্তের কাছে মুনিঋষির আজ্ঞা দেবাজ্ঞার ন্যায় মাননীয় এবং পালনীয়। তিনি মৃগয়ার খরতর ঔৎসুক্যে প্রধাবিত হইয়া ভয়কুণ্ঠিত পলায়নপর মৃগোপরি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন করেন, এমন সময় ঋষিদিগের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সেই আজানুলম্বিত উষ্ণশোণিতোত্তেজিত বলসারবাহু গুটাইয়া লইয়া তিনি সেই বীরহস্তোপযোগী শাণিত শর তূণীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।
ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয় মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
তদাশু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি॥

রাজা। সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব। ইতি যথোক্তং করোতি।

MOHARAJAH'S LIBRARY
5 MAR 1889
COOCH BEHAR.

"সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব।" বলিতে গেলে, দুষ্মন্ত প্রায় প্রণাম করিতে করিতেই সেই দুর্দ্দমনীয় শর শরাধারে ফেলিয়া দিলেন। মৃগয়োন্মত্ত বীরচূড়ামণি যেন একটা জঠরানলক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় কোন বৈদ্যুতিক শক্তি-দ্বারা আহত হইয়া নিমেষমধ্যে বিনষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। শকুন্তলা-নাটকের প্রতি শব্দে দুষ্মন্তচরিত্রের যেটি প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ বিরোধিভাবের অবিরোধে অবস্থান, সেটি প্রতিপন্ন। এমন নাটক কি আর হয়!

আর বিস্তার না করিয়া এমত বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর ১২০ কোটি মানবের মধ্যে এখনও ৭০ কোটি মানব

যেমন পুরাতন প্রথার কাছে এবং পুরাতন প্রথার যাজকদিগের কাছে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাভিভূত, কালিদাসের দুষ্মন্তও ঠিক্ তাই। কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্মন্ত কি সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিহীন ?—সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় নিজে ভাল মন্দ বিচার করিতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক—ধর্ম্মাচার্য্যেরা যা ভাল বলেন তাই ভাল মনে করেন, ধর্ম্মাচার্য্যেরা যা মন্দ বলেন তাই মন্দ মনে করেন? না, দুষ্মন্ত সে প্রকৃতির লোক নন। শার্ঙ্গরব তাঁহাকে বলিলেন যে পূজ্যপাদ মহা ঋষি কণ্ব তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়কার্য্যের অনুমোদন করিয়া শকুন্তলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন—

অয়ে। কিমিদমুপন্যস্তম্।

এ কি! মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছেন যে তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাপসকুলসম্ভ্রমকারী, তাপসকুলপক্ষপাতী, তাপসকুলভীত, তাপসকুলরক্ষক দুষ্মন্তের এই রকম উত্তর? আবার শুধু তাই? এই অসঙ্গত উত্তরটী শুনিয়া শার্ঙ্গরব ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া বলিলেন—

কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি। ননু ভবন্তএব সুতরাং লোকবৃত্তান্ত নিষ্ণাতাঃ।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং জনোঽন্যথা ভর্ত্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ।

এ কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত কি বলিলেন—

কিমত্র ভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

এ ত সেই অগ্নিপ্রভ সনাতনধর্ম্মনিরত ঋষিকুমারকে এক রকম মিথ্যাবদী বলা! শার্ঙ্গরব ভারতের একজন তেজস্বী ঋষিকুমার। মর্ম্মাহত হইয়া তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্তকে শ্লেষপূর্ণবাক্যে জিজ্ঞসা করিলেন—

কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ধর্ম্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ ?

দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন—

কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ ?

ভারতের ঋষিতপস্বী প্রবঞ্চক ? ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—যেখানে ভারতের ঋষিতপস্বী সত্যের বিরোধী, কুনীতিশিক্ষক, ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতে উদ্যত, সেখানে ঋষিকুলপক্ষপাতী, ঋষিকুলসন্ত্রমকারী দুষ্মন্ত ঋষিবাক্যেও হতশ্রদ্ধ। ইহার অর্থ এই—যেখানে পবিত্র ঋষিবাক্য সনাতনসত্যের এবং অপরিবর্ত্তনীয় অনপলাপ্য নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের বিরোধী, সেখানে দুষ্মন্তের কাছে ঋষিপ্রদত্ত ব্যবস্থা অপরিগ্রহণীয়, নিজযুক্তিসঙ্গত নীতিতত্ত্বই অনুসরণীয়। কিন্তু দুষ্মন্ত ঋষিবাক্য অসত্য বুঝিয়াও ঋষিদিগের প্রতি কোপাবিষ্ট নন—ঋষিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ নন। শার্ঙ্গরব মিথ্যা কথা কহিতেছেন বুঝিয়াও দুষ্মন্ত বলিতেছেন—

ভো স্তপস্বিনঃ চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণ মত্রভবত্যাঃ স্মরামি।
তৎকথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাখ্যানং
ক্ষেত্রিণমাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎসে।

ঋষির মুখে অশ্রদ্ধেয় কথা শুনিয়াও দুষ্মন্ত ঋষিচরিত্রের পবিত্রতা মনে করিয়া এখনও ঋষির প্রতি আস্থাবান্—এখনও ভাবিয়া দেখিতেছেন, কথাটা সত্য কি না। মনুষ্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেইখানে

প্রাচীন প্রথানুরাগী আচার্য্যকুলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা—সেইখানে পূর্ব্বাপর প্রচলিতপ্রথার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণাপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কাছে পোপের নাম Anti-Christ এবং রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম শয়তানের ষড়যন্ত্র। বৌদ্ধের কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এবং বেদ-পুরাণমূলকধর্ম্ম পৌরোহিত্যদূষিত কুসংস্কারকুণ্ড। দুষ্মন্তে জগতের দুইটি সামাজিক মানবপ্রকৃতি একত্রীভূত; কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে কর্কশতা নাই—সমাজদগ্ধকারী অগ্নিশিখা উঠে না। এরূপ সংঘর্ষ অসম্ভব নয়। ইংলণ্ডের ১৬৮৮ সালের রাজবিপ্লবে ইহার সম্ভবতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং আধুনিক মনুষ্যসমাজও বিনাবিরোধে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বিভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধনের দিকে ধাবমান দেখা যাইতেছে। কোম্তের সমাজদর্শনের আবির্ভাব এই স্পৃহার প্রধান নিদর্শন। দুষ্মন্ত এই গূঢ় ঐতিহাসিক নিয়মের চিত্র। দুষ্মন্ত এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানবপ্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি। দুষ্মন্ত সমগ্র মনুষ্যসমাজের ঐতিহাসিক-গূঢ়ার্থবোধক চরিত্র। দুষ্মন্ত ভূতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল—উভয়কালের সমষ্টি। দুষ্মন্ত সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসলক্ষিত নিয়তির কবিকল্পিত প্রতিমা।* এত বড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে আছে কি না সন্দেহ।

---

* বোধ হয় প্রাচীনভারতে ঐতিহাসিক প্রণালীতে মানবপ্রকৃতি নিরূপণ করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে ব্যক্তি ব্যক্তি-বিশেষ সম্বন্ধে সামাজিক চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি যে ইতিহাস পাইলে সেই তত্ত্ব ঐতিহাসিক

দুষ্মন্ত প্রচলিতমত এবং প্রচলিতপ্রথার অনুরাগী অথচ স্বাধীনচিন্তাশীল। ইহার অর্থ কি ? আমরা দেখাইয়াছি যে প্রচলিতপ্রথার প্রতি অনুরাগ মনুষ্যহৃদয়ের একটি মোহের স্বরূপ। মোহ অন্ধকার স্বরূপ—যাহাকে অধিকার করে তাহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না। দুষ্মন্ত সেই মোহের বশবর্ত্তী হইয়াও স্বাধীন! ইহার অর্থ—দুষ্মন্ত অন্ধ হইয়াও অন্ধ নন। অর্থাৎ আবশ্যক হইলেই দুষ্মন্ত জ্ঞানেরদ্বারা মোহের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন, তাহার দৃষ্টিনাশকারিতা দেখিতে পান। কিন্তু শুধু তা হইলেই কি হয়? এমন লোক আছেন, যাঁহারা দুষ্প্রবৃত্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারেন কিন্তু বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। না পারিবার কারণ কি? একটি কারণ তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তির শক্তিহীনতা; আর একটি কারণ অভিভূতাবস্থা হইতে উত্থানশক্তির অভাব। মনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে হইলে চেষ্টা বা উদ্যমের (effort) আবশ্যক। যে অবস্থা পরিত্যাগ করা যায় সে অবস্থা যতই অভিভাবকারী হয়, তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা ততই বলবৎ করা চাই। এই চেষ্টার মূল—ইচ্ছাশক্তি বা will power।

দুষ্মন্তের মুনিঋষির প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা যে রকম প্রবল দেখিয়াছি তাহাতে তাহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মুনিঋষি অপেক্ষা ভাল জিনিসের প্রয়োজন হইলে দুষ্মন্ত সহজেই সেই মোহ কাটিয়া ফেলিয়া

প্রণালীতেও বুঝিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন স্থলে সে ব্যক্তির মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝাইলে কোন দোষ পড়ে না।

সেই উৎকৃষ্টতর বস্তুটি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার অর্থ এই যে দুষ্মন্ত সৎপ্রবৃত্তির আধার। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর বলিয়া তিনি সহজেই মোহের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই সৎপ্রবৃত্তি তাঁহার মনকে অধিকার করে। অধিকার করিলে পর তাঁহার আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি বিনা আয়াসে মোহমুগ্ধাবস্থা হইতে অভিলষিত উৎকৃষ্ট অবস্থায় গমন করিতে পারেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই—দুষ্মন্ত এই আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তি কোথায় পাইলেন? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, সকল লোক যেমন আর আর মানসিক গুণ গুলি সমান পরিমাণে পায় না, তেমন তাহারা ইচ্ছাশক্তিও সমান পরিমাণে পায় না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, মানসিকশক্তির মূলপরিমাণ যতই হউক না কেন, সে শক্তি যতই প্রয়োগ করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুষ্মন্ত রাজা। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র রাজাদিগের রঙ্গভূমি ; সেইখানেই তাঁহাদিগকে জীবন-লীলা অভিনয় করিতে হয়। নানাপ্রকৃতিরলোকের সহিত, নানামতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত, অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সমস্যার সহিত, অসংখ্য অভাবনীয় অসম্ভবপর সহসাসম্ভূত বিপদের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব। এই সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়া, এই সকল গোলমালের মীমাংসা করিয়া, তাঁহাদিগকে তড়িৎবৎ কার্য্য করিতে হয়। দীর্ঘসূত্রিতা জগতের কার্য্যক্ষেত্রে অনর্থের মূল। এমনস্থলে নিজের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলে না, অপ্রখরবুদ্ধি হইলে চলে না, দীর্ঘসূত্রী হইলে চলে না। পাঠক এখন সহজেই বুঝিবেন যে এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রেই ইচ্ছাশক্তি

প্রয়োগের বেশী প্রয়োজন এবং সেইজন্য ইচ্ছাশক্তি বেশী আয়ত্ত এবং অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন, তালের্ঁা, পামার্ষ্টন, ডিস্‌রেলি, বিস্‌মার্ক—এই সকল রাজা এবং রাজমন্ত্রিগণের অসীম ইচ্ছাশক্তির কথা কে না জানে? কঞ্চুকী পার্ব্বতায়নের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে দুষ্মন্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সে স্থলে দুষ্মন্তের ইচ্ছাশক্তি যদি অসীম-বল এবং অনায়াস-প্রযোজ্য না হইবে তবে হইবে কার? প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দুষ্মন্তের যে আশ্চর্য্য চিত্তসংযমের চিত্র তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছি, পাঠক বোধ হয় এখন তাহার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুষ্মন্তের চিত্তসংযমশক্তি এত প্রবল কেন? না দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধানের ন্যায় জগতের প্রতি সদ্ভাব-পূর্ণ হইয়া, প্রখরবুদ্ধির অধিকারী হইয়া পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করত ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত করিয়াছেন। এইটী দুষ্মন্তের মনোগঠনপ্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব। ইহাই অভি-জ্ঞান-শকুন্তলের গূঢ় নাটকত্ব।

শকুন্তলা-নাটকের পঞ্চমাঙ্কবর্ণিত প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যটী দেখিয়াই আমরা দুষ্মন্ত-চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম। সে দৃশ্যটী দুষ্মন্তের সামাজিক জীবন প্রণালীর উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু সে দৃশ্যের হেতু দুর্ব্বাসার শাপ। তাই আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে দুর্ব্বাসার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা এবং সেই ঘটনা আছে বলিয়াই সে উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শকুন্তলা—নাটকের চরিত্র।

দুষ্মন্ত অসীম বলের অধিকারী। তাঁহার বাহুবল দেবতাদিগের কাছেও পরিচিত। কি মনুষ্যের শত্রু, কি দেবতার শত্রু, তিনি সকলেরই দমনকারী—সকলেরই বিজেতা। তিনি আলস্যবিদ্বেষী, শ্রমপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু। তিনি দিবারাত্রি রাজকার্য্য করিয়া ক্লান্তি অনুভব করেন না—মধ্যাহ্নরবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তাঁহার কাছে নিস্তেজ—অসীম শ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নন—তাঁহার অতুল দেহস্তম্ভ গিরিচর হস্তীর ন্যায় প্রভূত বলব্যঞ্জক। দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান—তাঁহার যে কয়টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি পুরুষজাতির গুণ। রমণীরত্ন শকুন্তলা সে রকমের নন। সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলা সেই পবিত্রসলিলা মালিনীনদীতীরস্থ পরমরমণীয় শান্তিরসপরিপ্লুত তাপসাশ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিতে আসিতেছেন। তিনটি বালিকা দেখিতে প্রায় এক রকম—বয়সে প্রায় এক রকম—একত্রে প্রতিপালিতা—এক-মন, এক-প্রাণ, এক-আত্মা। একটি সখী শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

হলা শউন্তলে তত্তোবি তাতকণ্ম অস্মমরুক্খআ পিঅদরা ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবাল পরিউরণে নিউত্তা।

নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাফুল আর নবপ্রস্ফুটিত শকুন্তলাফুল একই বস্তু। এটিও যেমন সুন্দর ওটিও তেমনি সুন্দর। এটিও যেমন কোমল, ওটিও তেমনি কোমল। এটিও যেমন নরম, ওটিও তেমনি নরম। এটিও যেমন মধুরতাময়, ওটিও তেমনি মধুরতাময়। এটিও যেমন ক্ষুদ্র, ওটিও তেমনি ক্ষুদ্র। রমণীপুষ্প অনেক রকম আছে; কোনটি গোলাপ, কোনটি চাঁপা, কোনটি টগর, কোনটি জবা, কোনটি ভায়লেট, কোনটি পদ্ম, কোনটি কর্ণিকার। এগুলির মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। কিন্তু সকলেরই একটি বিশেষ গুণ আছে—সকলেই পুষ্পজাতীয় কোমলতার অধিকারী। সকলেই যে বৃক্ষকাষ্ঠ বা লতারজ্জু অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই কাষ্ঠ এবং রজ্জু অপেক্ষা কোমল। নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্প সেই কোমলতার প্রাণস্বরূপ। কেন না ইহা যেমন কোমল, তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি পাতলা এবং তেমনি ফুট্‌ফুটে। তাই অনসূয়া বলিতেছেন যে, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরুলতাগুলিকে শকুন্তলা অপেক্ষা ভালবাসেন। কেন না, শকুন্তলার দেহখানি যে রকম কোমল, তাহাতে সেই তরুলাগুলিতে জল দিয়া বেড়াইতে হইলে, তাহা অবশ্যই শ্রমক্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। আর হইলও তাই। দুইটি কি তিনটি মাত্র বৃক্ষে জলসেচন করিয়াই শকুন্তলা যেন একেবারে আলুথালু হইয়া পড়িলেন এবং হাঁপাইয়া উঠিলেন।

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণা
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাস্তসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥

ক্ষুদ্র কলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল; শ্রমাধিক্য বশতঃ তাঁহার ধমনীপ্রবাহিতশোণিতস্রোত খরতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ করপদ্মটীকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল; তাঁহার নিঃশ্বাস ঘনঘন পড়িতে লাগিল এবং নবযৌবনোন্নত বক্ষ ঝটিকাবিক্ষিপ্তস্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সুকোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাঁহার কর্ণের শিরীষ পুষ্পগুলি অতি সুকোমলভাবে জড়াইয়া গেল; তাঁহার অলকাগুলি তাঁহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অতি সামান্য শ্রমে শকুন্তলা পুষ্পটী যেন বৃন্তস্খলিত হইয়া পড়িল! যেন ক্ষুদ্র লজ্জাবতী লতাটী অঙ্গুলিস্পর্শানুভব করিতে না করিতেই সঙ্কুচিত হইয়া গেল! এইজন্যই দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া মহর্ষি কণ্ব সুকোমল নীলোৎপলপত্রের কোমলতম ধারেরদ্বারা কঠিনতম শমীবৃক্ষচ্ছেদনরূপ অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাইতেছেন।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু স্তপঃক্রমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবসাতি॥

আমরা সকলেই পদ্মের পাতা দেখিয়াছি—নীলজলে বড় বড় পদ্মপত্র ভাসিতে দেখিয়াছি। জল সে পাতার প্রাণ—সে পাতা যেন কি রকম জলীয় শক্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেন কি রকমে জল একটু ঘন হইয়া পাতা হইয়া গিয়াছে। সে পাতা কি কোমল! কোমলতাময়ী শকুন্তলা নখদ্বারা সেই পাতাতেই অক্ষর কাটিয়াছিলেন।

সে পাতায় নখের আঘাত সহ্য হয় না। নখস্পর্শে সে পাতা যেন গলিয়া যায়। আবার সেই বড় পাতাটিকে আস্তে আস্তে মৃণাল হইতে ছিঁড়িয়া তোল, পাতাটি অমনি যেন ঢলিয়া পড়িবে। সে পাতার আবার ধার কি গা? যদি কোমলতার ধার থাকে তবে সে পাতার ধার সেই ধার। যদি কোমলতার কোমলতা থাকে, তবে সে কোমলতার নাম 'নীলোৎপলপত্রের ধার।' শকুন্তলার কোমলতা সেই রকম কোমলতা। যদি সে কোমলতার অপেক্ষা বেশী কোমলতা জগতে থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের কল্পনাতীত। এখন সেই কোমলতার সহিত দুষ্মন্তের বলিষ্ঠতার তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থই বোধ হইবে যে, দুষ্মন্ত যে কঠিন শমীবৃক্ষ এবং কোমল নীলোৎপলপত্রের কথা বলিয়াছেন, স্বয়ং দুষ্মন্তই সেই শমীবৃক্ষ এবং তাঁহার শকুন্তলাই সেই নীলোৎপলপত্র। জগতে শারীরিক গঠন এবং শারীরিক বলসম্বন্ধে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যথার্থই এত প্রভেদ। কর্ম্মের মূল শারীরিক বল এবং সেই জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের—রমণীর নয়। জলসেচনশ্রমকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইনি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্যা?

কিন্তু বলহীন হইয়াও শকুন্তলা বলিষ্ঠা; কোমল হইয়াও শকুন্তলা কঠিনা; শ্রমকাতরা হইয়াও শকুন্তলা কষ্টসহিষ্ণু। আমরা দেখিয়াছি যে, একটি ক্ষুদ্র কলস বহন করিতে হইলে শকুন্তলা ভারাক্রান্তা বোধ করেন; একটি ক্ষুদ্র কলস হইতে দুইটি কি চারিটি বৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া বেড়াইলেই শকুন্তলা আলুথালু হইয়া পড়েন। কিন্তু কোমলহৃদয়ে

বিষম দুঃখভার ধারণ করিয়াও শকুন্তলা সুদীর্ঘ পথ হাঁটিতে শ্রান্তি অনুভব করেন না। হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বড় কম দূর নয়। সেই দূরপথ অরণ্যে পরিপূর্ণ। অরণ্যপথে গমনাগমন কর বিষম কষ্টসাধ্য। যেখানে অরণ্য নাই, সেখানে প্রচণ রবি। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে রবিকিরণ নিতান্ত অসহনীয়। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে শকুন্তলার বিলম্ দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিতেছেন—

ভগবান্ দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা তত্ত্বরায়াত্রভবতীম্।

সেই প্রিয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বল শকুন্তলা সেই প্রচণ্ড রবিকিরণে হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্র করিলেন। পথিমধ্যে কতই কষ্ট সহ্য করিলেন। করিয় মধ্যাহ্নকালে দুষ্মন্তের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দুষ্মন্তের বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই—পথশ্রমের শ্রান্তি বিহ্বলতা নাই—আতপতাপিতার আরক্তিমতা নাই—দূর পথগমনের স্বেদবিন্দুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয় দুষ্মন্ত কেবল এই মাত্র বলিলেন—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥

আবার শকুন্তলা তখন মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা রমণি! তুমি কোমলতমা হইয়াও কঠিনতমা; তুমি বলহীন হইয়াও বলিষ্ঠা; তুমি শ্রমকাতরা হইয়াও বিষম কষ্টসহিষ্ণু তুমিই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য! একদিন জনকনন্দিনীও এ

অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছিলেন। নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাম সীতার নিকট গিয়া বলিলেন—“প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝর জলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দ্দান্ত হিংস্র-জন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ং-পতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ভস্থ উরগেরা গমন-পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়-ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে

না [*]।” কিন্তু বনবাস তাঁহাকে সাজিয়াছিল কি না তাহা সকলেই জানেন। ইতিহাসেও আমরা এই রহস্য দেখিয়া থাকি। বিপদ্‌গ্রস্ত শিশুসন্তানের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জননী অনেক সময়ে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অগ্নিরাশি তুচ্ছ করিয়াছেন, জলরাশি ভেদ করিয়াছেন। ভারতে রমণীবীরত্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী বীরদর্পে পুরুষোত্তম যাইতেছেন, গয়া-কাশী যাইতেছেন, কামরূপ-রামেশ্বর যাইতেছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—পুরুষ, শরীরের বলে বলিষ্ঠ; রমণী, হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠা। পুরুষ সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষম; রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্ম্মক্ষম। পুরুষ সর্ব্বক্ষণই জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দেন। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম। কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থায় পতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোন প্রভেদ থাকে না—তখন কোমলতম নীলোৎপলপত্র কঠিনতম শমীবৃক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতি এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্য মধ্যে পরিগণিত।

যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা বলিষ্ঠা, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা কার্য্য করিতে অক্ষম। রমণীহৃদয়ের এই আশ্চর্য্য রহস্য মহাকবি কালিদাস যে প্রকারে দেখাইয়াছেন জগতের আর কোন কবি সে প্রকারে দেখান নাই। দুষ্মন্ত

---

[*] হেমচন্দ্র—অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫৩—৫৪ পৃষ্ঠা। স্থানে স্থানে দুই এক পংক্তি ছাড়িয়া দিলাম।

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রীত্যনুসারে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলা সকল কর্ম্ম ভুলিয়া—প্রিয়তমা প্রিয়ম্বদাকে ভুলিয়া—প্রিয়তমা অনসূয়াকে ভুলিয়া—আশ্রমের লতা-মৃগগুলিকে ভুলিয়া—কেবল দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ভিতর বাম-কর-তলে গণ্ড স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিষ্পন্দভাবে দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। এমন সময়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনপ্রতিম মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে 'অয়মহং ভোঃ' বলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরস্থিতা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বরে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার ইষ্টদেবতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছেন, তাঁহারা যেন সিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তনিমগ্না প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিষ্পন্দা শকুন্তলা নিষ্পন্দভাবেই রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাতে নাই; তখন তাঁহার কাছে বাহ্য জগৎ প্রলয়নিমগ্ন; মানবাত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনি হৃদয়সর্ব্বস্ব শকুন্তলা তখন দুষ্মন্তে লীন; তখন যদি এই পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড ঘোররবে ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাপ্রলয়ে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে দুষ্মন্তময়ী শকুন্তলা সেই সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে মিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও পারিতেন না যে কি হইল! বজ্রগম্ভীর স্বরে দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন--

আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

এখনও সংজ্ঞা নাই! জীবিতা শকুন্তলা এখনও জীবনহীন! তাঁহার জীবন, জ্ঞান, দেহ, দৈহিক শক্তি—সকলই এখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ে বিলুপ্ত। সে হৃদয় যথার্থই অতলস্পর্শ। প্রেমানলসন্তাপিতা শকুন্তলা যখন প্রথম দুষ্মন্তের কথা বলেন, তখন প্রিয়ম্বদা বলিয়াছিলেন যে বেগবতী স্রোতস্বিনী মহাসাগরাভিমুখেই ছুটিয়া থাকে। দুষ্মন্ত নানাগুণে গুণবান্—তাঁহার চরিত্রের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম বলিলেই হয়। শকুন্তলাচরিত্রের বিস্তার নাই। তাঁহাতে দুষ্মন্তের বাহুবল নাই, শস্ত্রনৈপুণ্য নাই, মৃগয়াচতুরতা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, উচ্চ বিচারশক্তি নাই, অপরিমেয় কর্ম্মশীলতা নাই, অপরিমেয় শ্রমশীলতা নাই, অপরিমেয় কার্য্যদক্ষতা নাই। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতা এবং অনন্ত সমুদ্রের গভীরতা সমান। পুরুষ, চরিত্রবিস্তারে সমুদ্রবৎ—রমণী, হৃদয়গভীরতায় সমুদ্রবৎ। পুরুষ ভালবাসার সামগ্রীকে রমণীর মত তত আত্মগত করিতে পারে না—তত আপনাতে মিশাইয়া লইতে পারে না—তত আত্মবিস্মৃত হইয়া, তত জগদ্বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে পারে না। পুরুষ-হৃদয়ের গভীরতা কম। সেই জন্য পুরুষ বিরহে অস্থির হইয়া পড়ে। রমণীহৃদয়ের গভীরতা অপরিমেয়। সেই জন্য রমণী বিরহে হৃদয়স্বর্ব্বস্ব, হৃদয়ময়ী হইয়া থাকে। দুষ্মন্তকে ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা একেবারে জীবনহীন প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্পন্দহীনা। কিন্তু অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনানন্তর শকুন্তলাকে ভাবিতে ভাবিতে দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির, অনেকটা গাম্ভীর্য্যভ্রষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় প্রগল্‌ভ।

শকুন্তলার হৃদয় অনন্তাধার—যতই কেন দুঃখ হউক না সে হৃদয়কে ছাপাইয়া উঠিয়া দেহ বা জ্ঞানকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কারণ হৃদয়ের তুলনায় শকুন্তলার দেহ এবং জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। দুষ্মন্তের হৃদয় পরিমিতাধার,—ভাবনা একটু বেশী হইলেই সে হৃদয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়া শরীরকে অস্থির করিয়া তুলে, জ্ঞানকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। হৃদয়ের মোহে রমণী বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যান, পুরুষ ভুলিয়া যান না। শকুন্তলা সেই ভয়ঙ্কর “অয়মহং ভোঃ” শুনিতে পাইলেন না —সেই ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দুষ্মন্ত বিহ্বল-হৃদয়, বিহ্বল-জ্ঞান, এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াও বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণমাত্র বীরবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুষ্মন্তকে শোক-বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মাতলি মাধব্যকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্ত মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্”। মাতলি উত্তর করিলেন—

> ‘তদপি কথ্যতে কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি।’

মাতলি সিদ্ধকাম হইলেন। শোক-বিহ্বল দুষ্মন্তের কাছে বাহ্যজগৎ প্রবল হইল। নিমেষমধ্যে দুষ্মন্তের শোক-বিহ্বলতা কর্ম্মশীলতায় পরিণত হইল। কিন্তু হৃদয়মুগ্ধা শকুন্তলা ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাসাসত্ত্বেও হৃদয়মুগ্ধা রহিলেন। বিলুপ্ত বাহ্যজগৎ বিলুপ্তই রহিল। হৃদয়মগ্নার নিশ্চেষ্টতা নিশ্চেষ্টতাই রহিল। যে হৃদয়ের গুণে রমণী চেষ্টাশীলা সেই হৃদয়ের গুণেই রমণী নিশ্চেষ্টা। হৃদয়ই রমণীচরিত্রের প্রধান

ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। হৃদয়ের গুণেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে ভিন্ন। কালিদাসের শকুন্তলা সেই রমণী-হৃদয়রহস্যের উজ্জ্বলতম প্রতিমা। এবং সেই প্রতিমা পুরুষ চরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতম অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। এমন তুলনামূলক নারীহৃদয়প্রতিমা জগতের আর কোন নাটকে নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রিয়বস্তুর বিরহ রমণীহৃদয়ে এত লাগে কেন, পুরুষহৃদয়ে এত লাগে না কেন? দুষ্মন্ত ত শকুন্তলাকে রাখিয়া রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া শকুন্তলা এমন হইলেন কেন। ইহার কারণ এই,—পুরুষ প্রিয়বস্তুকে শুধু হৃদয়ে রাখিয়াই অনেকপরিমাণে সন্তুষ্ট; রমণী তা নয়। রমণী প্রিয়বস্তুকে চোকে চোকে রাখিতে চায়। পুরুষ প্রিয়বস্তুর কল্পনাতে সন্তুষ্ট; রমণী খোদ প্রিয়বস্তু ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট নন। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Nineteenth Century তে অধ্যাপক মেলক A Dialogue on Human Happiness নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি পুরুষ আর একটি রমণী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী সতেজে বলিতেছেন—"Heavens! do you know so little as to think that were a man in love really, he could endure to be absent, without necessity, a day from the woman he was in love with? No: he is never happy when away from her." সম্ভাষিত পুরুষ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং বলিলেন যে ইহাকে যদি প্রণয় বলে তবে যেন প্রণয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে। রমণীহৃদয় শুধু হৃদয়ে ভর করিয়া থাকিতে পারে না। রমণী হৃদয়ের বস্তুকে সর্ব্বদাই

চোকের উপর রাখিতে চাহেন। সেই নিমিত্ত যখন হৃদয়ের বস্তু চোকের অন্তরালে থাকে, তখন রমণী আপন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া কল্পনার বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলেন, এবং সেই কল্পনাসম্ভূত বস্তুতে প্রকৃত বস্তু বোধে মিশাইয়া থাকেন। রমণী বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না। পুরুষের মন অনেক পরিমাণে সেই মনসাপেক্ষ ; কিন্তু রমণীহৃদয় বাহ্যজগৎসাপেক্ষ। এবং সেই নিমিত্তই বাহ্যজগতের অভাবে রমণী তাঁহার আশ্চর্য্য হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্য্যতম বাহ্যজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে আশ্চর্য্য বাহ্যজগতের কাছে প্রকৃত বাহ্যজগৎ অস্তিত্বহীন। পুরুষজাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কেহ সে রকম আশ্চর্য্য বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাসেও দেখা যায় যে যেখানে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ জগৎ, সেখানে বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত। যে যোগীর মনে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, সে যোগীর নয়নে বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ—অস্তিত্বহীন। যে শকুন্তলার চক্ষে সম্মুখস্থ বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই শকুন্তলার হৃদয়ে দূরবর্ত্তী দুষ্মন্ত প্রত্যক্ষ। রমণী প্রত্যক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষানুরাগী, প্রত্যক্ষাপেক্ষী এবং সেই জন্য শোকে এবং বিরহে রমণী এত অন্তর্লীনতাপ্রিয়। কালিদাস ভিন্ন আর কোন কবি এই নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝান নাই! পর্ণকুটীরে দুষ্মন্তনিমগ্না শকুন্তলা,—এটি উৎকৃষ্ট কবি প্রতিভার অক্ষয়, অনন্তমহিমাপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম কীর্ত্তি। এ কবি যাহাদের, তাহারা যথার্থই জগতে স্পর্দ্ধাক্ষম।

আমরা শকুন্তলার যে মূর্ত্তিটী দেখিলাম সেটি স্ত্রীজাতির অন্তর্লীন মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়, ভীত হইতে হয়। এই আশ্চর্য্য অন্তর্লীনতা ভাবপ্রখরতার ফল। এত ভাবপ্রখরতা (Intensity of feeling) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অস্তিত্ব আমাদিগকে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, যে মুহূর্ত্তকালের জন্য বাহ্যজগৎ দেখিয়াছে এবং বাহ্যজগতে বাস করিয়াছে সে কখন এত অন্তর্নিমগ্ন হইতে পারে না, এত অন্তর্লীনতাপ্রাপ্ত হয় না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা ভীত হই। আমাদের বোধ হয় যে যাহার এত ভাবপ্রখরতা সে যদি শকুন্তলার ন্যায় ভাল হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেক্সপীয়রচিত্রিত মেকবেথপত্নীর ন্যায় মন্দ হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা মন্দ জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না। এবং জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে পুরুষ যতই ভাল হউক না, ভাল স্ত্রীর মতন ভাল হইতে পারে না—এবং যতই মন্দ হউক না, মন্দ স্ত্রীর মতন মন্দ হইতে পারে না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই। আমাদের বোধ হয় যেন একখানা প্রকাণ্ড হিমশিলাখণ্ড অনন্তকাল গিরিকন্দরবদ্ধ—কখন গলে নাই, কখন গলিতে পারিবেও না। কিন্তু রমণীহৃদয় রহস্যময়। আবদ্ধ হিমশিলাখণ্ড যেমন গলে, আবদ্ধ রমণীহৃদয়ও তেমনি গলে। এবং হিমশিলা

গলিয়া যেমন তরু, লতা, প্রস্তর সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, রমণীহৃদয় গলিলেও তেমনি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, কোমলহৃদয়, কঠিনহৃদয় সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। কথাটি সত্য কি না, অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিদায়-দৃশ্যটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সে দৃশ্যের ন্যায় কোমল, হৃদয়াপহারী, কবিতাময়, মানবপ্রকৃতি-প্রকাশক জিনিস আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা চিরকালের জন্য আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সেই পবিত্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শকুন্তলা-পালিতা আশ্রমটী যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল। "মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।" যাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে হইলে, সমস্ত বাসস্থানটী বিরহকাতর বলিয়া অনুভব হয়, সে যথার্থই সেই বাসস্থানের প্রাণ! আজ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতির বোধ হইতেছে যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শান্তিময় আশ্রয়স্থল সেই পবিত্র আশ্রমটী প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। শকুন্তলা যেদিকে চাহিতেছেন, সেইদিকেই তাঁহার স্বহস্তপ্রতিপালিত, তাঁহার সুমধুর-স্নেহপরিপুষ্ট তরু, লতা, মৃগ, মৃগীসকল বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কয়েক পদ গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন—'পিতঃ। লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ

করি।' পিতা জানিতেন যে আশ্রমের সকল পদার্থই শকুন্তলার স্নেহের বস্তু এবং শকুন্তলা আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—'জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে! এই সে দক্ষিণপার্শ্বে রহিয়াছে।' অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন—'বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহুদ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আমি আজ অবধি তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি!' পাঠক জানেন যে নবমল্লিকাটীকে শকুন্তলা বড়ই ভালবাসিতেন। জলসেচনকালে নবমল্লিকাটীকে দেখিয়াই তিনি কল্পনাপূর্ণ স্নেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন-

হলা রমণীআো ক্খু কালো ইমস্স পাদবমিহুণস্স রদিঅরো সম্বত্তো জেণ ণব কুসুমজোব্বণা নোমালিআ অঅং পি বহুফলদাএ উঅভোঅক্খমো সহআরো॥

তাই আজ শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণীরত্ন রমণীরত্নের ন্যায় সখীদ্বয়কে বলিলেন—'সখি! আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম!' সখীদ্বয় আকুলপ্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' আমরাও যদি তখন সেখানে থাকিতাম তাহা হইলে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ন্যায় বিগলিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিতাম—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' তার পর সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভমন্থরা মৃগীটীকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিত-

প্রাণা জননীর ন্যায় বলিলেন—‘এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা গী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও, সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দবে।’ আহা! ক্ষুদ্রবালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে ারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! সে হৃদয় আজ কত াতনাই সহ্য করিতেছে! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার াশ্চাদ্ভাগ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দখিলেন যে, যে মৃগটীর মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি যত্নে ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতেন এবং যাহাকে ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন সেই পুত্রাধিকপ্রিয় গটী মুখাগ্র দ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। স্নেহময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বনপশু যাহার স্নেহে মুগ্ধ, যাহার রহে আকুলিতপ্রাণ, তাহার ক্রন্দন দেখিলে সমস্ত বিশ্বদয় কাঁদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী স্রোতবনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া াইয়াও যাওয়া হইতেছে না দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন—ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে নুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর, যা বলিার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।’ তখন সকলে বটবৃক্ষায়ায় উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিলে পর মহর্ষি ণ্ দুষ্মন্তকে যাহা বলিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিলেন, কুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্তলাকে বলিলেন। লিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—‘বৎসে! তুমি আমাকে এবং খীদিগকে আলিঙ্গন কর।’ শকুন্তলা জানিতেন যে কণ্ব

তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়াকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে। বুঝিয়া কাতরতম অপেক্ষা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতঃ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবেন? উত্তর প্রতিকূল হইল। কিন্তু সুশীলতমা শকুন্তলা বর্দ্ধিত যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া বিহ্বলহৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, সখি! তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর! তিনহৃদয়ে একহৃদয়, একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন? তিনটি সন্তপ্তহৃদয় এক হইয়া গেল! তাই দেখিয়া সমস্ত বিশ্বহৃদয় সেই আশ্চর্য্য হৃদয়কুণ্ডে গলিয়া পড়িল! সমস্ত বিশ্বমণ্ডল হৃদয়ময় হইয়া সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উদ্বেল হইতে লাগিল! হৃদয়ময়ি শকুন্তলে, যেখানে তুমি সেখানে হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না। তোমার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মন্ত্রমুগ্ধ! যাওয়া ত আর হয় না। শার্ঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে প্রখররবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন। তখন যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে একবার শেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত-পূর্ব্বস্মৃতি-পরিমিত-যন্ত্রণা-কাতরস্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন-'পিতঃ কবে আবার তপবোন দেখিব!' কাতরহৃদয়ের শেষ নিশ্বাস—সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দন—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা

দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, জীবাত্মা সিহরিয়া উঠে! কথাটি কণ্বের হৃদয়ে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—'বাছা! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দেও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।' জ্ঞানময় তাপস-প্রধান হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—'বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।' পিতার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া ধর্ম্মানুরাগিণী তাপসবালা আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমলহৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত; অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।' তাপসপ্রধান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—'বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধানের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব, তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!' বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন; দৃঢ়মনা পুরুষবর এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণীহৃদয়! সে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রতুল্য পুরুষও অবনত; জগতের তাপসকুলাচার্য্যও বিজিত! সে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ়! এ রহস্য কে বুঝাইবে! তার পর সহযাত্রিগণের

সহিত শকুন্তলা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কাশ্যপাশ্রম প্রাণহীন হইল! হিমালয় প্রদেশের বন-জ্যোৎস্না ডুবিল! যে কৌশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়-দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি সেক্সপীয়র প্রদর্শিত এণ্টনীর বক্তৃতা-রচনা-কৌশল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

কিন্তু রমণীর বাহ্য-জগৎ-বিস্মৃতি যেমন গভীর তাঁহার বাহ্যানুভূতি তেমনি প্রখর—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান যে পরিমাণে বিলুপ্ত হয় সেই পরিমাণে তীব্রভাবও ধারণ করিয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হইয়া গেলেও যেমন তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় না, আবার একটি বালুকা-কণা স্থানভ্রষ্ট হইলেও তিনি তেমনি মহাপ্রলয় আশঙ্কা করিয়া থাকেন। শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর শাপধ্বনি সত্ত্বেও স্থির, অবিচলিত, নিষ্পন্দ; কিন্তু একটি ভ্রমরের তাড়নায় একেবারে ক্ষিপ্ত-প্রায়—এমনি ব্যতিব্যস্ত যেন পৃথিবী রসাতলে গেল। এ রহস্যের অর্থ এই যে, রমণী যাহা ভালবাসেন তাহাতে এমনি মিশিতে পারেন যে আর কিছুই তাঁহার মনে স্থান পায় না, তাহাতেই যেন ডুবিয়া যান; কিন্তু যাহা ভালবাসেন না তাহাতে মিশিতে নিতান্তই অক্ষম, তাহা তাঁহার নিতান্তই অসহনীয়, তাহার নাম মাত্র শুনিলে যেন জ্বলিয়া যান। ইহার কারণ এই যে তিনি হৃদয়-প্রধান। যখন তাঁহার হৃদয়ের কার্য্য হয় তখন তাহা নির্ব্বিরোধে হইয়া থাকে। কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, যত প্রখর হইবার তা হয়। পুরুষ হৃদয়প্রধান নন এবং তাঁহার যে স্বল্প পরিমাণ হৃদয় আছে

তাহাও জ্ঞান-মিশ্রিত। সুতরাং পুরুষ ভালবাসার পাত্রকে মণীর ন্যায় ভালবাসিতে পারেন না এবং ঘৃণার পাত্রকে মণীর ন্যায় ঘৃণা করিতেও পারেন না। পুরুষ রমণীর ন্যায় তত ভাবে মগ্ন হইতেও পারেন না, তত চঞ্চল হইতেও পারেন না। রমণীর অন্তর্লীনতাও যেমন গভীর বাহ্যানুভূতি বা sensibility ও তেমনি প্রখর।

শকুন্তলা স্নেহময়ী। কিন্তু সে স্নেহের একটি প্রণালী আছে। পুরুষের স্নেহ সে প্রণালীর অনুগামী নয়। কণ্ব আশ্রমের তরু লতা মৃগ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসেন। আমরা অনসূয়ার মুখে শুনিয়াছি যে তিনিই শকুন্তলাকে জলসেচন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে জলসেক করেন না। দুষ্মন্ত তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে ভালবাসেন। মৃতবণিকের উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্‌॥

কে কোথায় কবে বন্ধুহীন হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেই যখন বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। এ স্নেহের পাত্রবিশেষ নাই। এ স্নেহ প্রকাশ করিতে হইলে পাত্রবিশেষ দেখিবার প্রয়োজন নাই, পাত্রবিশেষ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এ স্নেহ শ্রেণীগত, পাত্রবিশেষনিহিত নয়। কষ্ট না দেখিতে পাইলেও এ স্নেহের বিকাশ আছে। আর এ স্নেহ পরের দ্বারা কার্য্য করিয়াই পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতিরপ্রতিমা শকুন্তলার স্নেহ এ জাতীয় নয়।

সে স্নেহের পাত্র কল্পনায় থাকে না, নয়নপথের বহির্ভূত থাকে না। সে স্নেহের পাত্র কে? সে স্নেহের পাত্র শকুন্তলা যে আশ্রমে বাস করেন সেই আশ্রমের তরুলতা, সেই আশ্রমের মৃগপক্ষী. সেই আশ্রমের স্ত্রীপুরুষ। সে স্নেহের অবয়ব কিরূপ? বলিতে গেলে সে স্নেহ সাকার। শকুন্তলার কাছে আশ্রমের তরুলতাগুলি ভাইভগিনী, মৃগমৃগীগুলি পুত্রকন্যা, পুষ্পগুলি চন্দ্র-সূর্য্য। তিনি কোন লতাটীকে বনজ্যোৎস্না বলিয়া ডাকেন, কোন লতাটীকে না জানি আর কি বলিয়া ডাকেন। পুরুষের স্নেহ এ পদ্ধতির নয়। বলিতে গেলে সে স্নেহ নিরাকার। আর শকুন্তলা যাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকে কি রকমে স্নেহ করেন? তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহাদের আশ্রমের একটি মৃগী একটি বৎস প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। তিনি সেই মৃগশাবকটীর জননীস্বরূপ হইয়া তাহাকে ক্ষুধায় ধান্য খাওয়াইয়া, তৃষ্ণায় জলপান করাইয়া, রোগে শুশ্রূষা করিয়া বড় করিয়াছিলেন। তিনি যখন জলসেচন করিতে যান, তখন তাঁহার বোধ হয় যে আতপতাপিতা তরুলতাগুলি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। মহর্ষি কণ্ব বলেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

এখানে স্ত্রীজাতির আর একরকম কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে। পুরুষের শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়;

রমণীর শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরপথ-গমন, রৌদ্রে ভ্রমণ, অবিশ্রান্ত হস্তপদচালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কার্য্যে পুরুষের শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রকাশ। ক্ষুধায় উপবাস, তৃষ্ণায় পিপাসাক্লেশভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতা। দুইপ্রকার কষ্ট-সহিষ্ণুতার মধ্যে রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতাই গুরুতর। উত্তমরূপে পানাহার করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অপেক্ষা পানাহার না করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অধিক ক্লেশকর। কিন্তু পুরুষাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু হইয়াও রমণীর কষ্ট অপ্রকাশ। যে কষ্টে জগৎ রক্ষিত হয়, সে কষ্ট জগৎ দেখিতে পায় না। রমণীর প্রকৃত বীরত্ব, রমণীর প্রকৃত মহত্ত্ব নিভৃতে নিস্তব্ধভাবে জগতের মহৎ-কার্য্যসাধনে নিয়ত নিযুক্ত। কিন্তু খুঁজিয়া পাতিয়া না দেখিলে জগৎ সে বীরত্ব এবং সে মহত্ত্ব দেখিতে পায় না। সে মহত্ত্ব যেন অনন্তকাল খুঁজিয়া পাতিয়াই লইতে হয়! রমণীরত্ন যেন অনন্তকাল নিভৃতই থাকে! সে রত্ন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আনিলে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিষ্ফল, ‘খেলো’ হইয়া পড়িবে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত অবলম্বন করিয়া কেহ যেন পৃথিবীকে মায়াশূন্য, হৃদয়শূন্য, ধাত্রীশূন্য, জনশূন্য না করেন। রমণীই প্রকৃত জগদ্ধাত্রী।

একবার একটি মৃগশাবক তাহার জননীকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন,

অণসূএ জহ এসো ইদো দিস্মদিট্‌ঠী উস্মুঅো মিঅপোদয়ো মাদরং অন্মেসদি এহি সংজোএম ণং।

এই বলিয়া সেই মৃগশাবকটীকে তাহার মার কাছে দিতে গেলেন। শকুন্তলাও এইরূপ করেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, রমণীর অন্তর্লীনতাও যেমন প্রগাঢ়, বাহ্যবিলীনতাও তেমনি প্রগাঢ়। রমণী যেমন বাহ্যজগৎ ভুলিয়া আপনাতে মিশিতে পারেন, তেমনি আপনাকে ভুলিয়া বাহ্যজগতেও মিশিতে পারেন। স্নেহময়ী রমণী স্নেহের বস্তু পাইলে স্বয়ং তাহাকে লালন পালন করেন, স্বয়ং তাহাতে মিশিয়া যান। পুরুষের স্নেহ বস্তুবিশেষন্যস্ত নয়; পুরুষ রমণীর ন্যায় স্নেহের বস্তুকে 'কোলে পিঠে' করিয়া রাখেন না; স্নেহের বস্তুর জন্য নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান না, রাত্রিকে দিবা করেন না, দিবাকে রাত্রি করেন না; স্নেহের বস্তুতে লীন হন না। পুরুষের স্নেহ মনে মনে থাকে; রমণীর স্নেহ বস্তুতে থাকে। পুরুষের স্নেহ abstract নিহিত; রমণী স্নেহ concrete নিহিত। পুরুষের স্নেহ অন্তর্জগৎনিবদ্ধ; রমণীর স্নেহ বাহ্যজগৎলিপ্ত। এই নিমিত্তই রমণী শিশুর ধাত্রী, রোগীর চিকিৎসক, আতুরের বন্ধু, জগতের পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale); এইনিমিত্তই কৃপাময়ীভগিনী সম্প্রদায় (sisters of mercy)। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এখনও দেখিতেছি, রমণীহৃদয় সাকারপ্রিয়, জড়ানুরক্ত। সেই জন্য রমণীমণ্ডলে পৌত্তলিক ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবল। সেইজন্য ১৭৯৩ সালের ফরাসিবিপ্লবে ফরাসীদার্শনিকেরা মাদাম রোলাঁর শিষ্য হইয়া বিপ্লবের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের অতি উৎকৃষ্টভাব সকল স্ত্রীজাতির মনে শুধু ভাবরূপে থাকে না;

বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎজড়িত এবং জড়জগৎ সাপেক্ষ। এই নিমিত্ত রমণীর স্নেহ সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিণত হয়। জগতে 'সেণ্টিমেণ্টাল' রমণী নাই বলিলেই হয়।

কালিদাসের শকুন্তলা সেক্সপীয়রের পোর্শিয়া, রোজালিন্দ, কি ইজাবেলার ন্যায় প্রখরবুদ্ধি নন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি সামান্য হিসাবে বুদ্ধিমতী। তিনি পোর্শিয়ার ন্যায় নৈয়ায়িক নন, ইজাবেলার ন্যায় নীতিশাস্ত্রবেত্তাও নন। আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার বয়সে এবং তাঁহার অবস্থায় সে রকম হইলে ভালও হইত না। আমাদের বোধ হয় যে কালিদাস শকুন্তলাকে সাধারণ স্ত্রীজাতির প্রতিমারূপে চিত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হৃদয়-প্রধান করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই চারিটী জ্ঞান প্রধান থাকে বটে। কিন্তু সে দুই চারিটী স্ত্রীপ্রকৃতির নিয়ম-বহির্ভূত। জ্ঞান-প্রধান হইতে হইলে রমণীকে প্রায়ই রমণীপদ এবং রমণীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। মিস্ মার্টিনো তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, রমণী যদি পণ্ডিতা হইতে চান তবে তিনি যেন সংসারাশ্রম প্রবেশ না করেন। আর যেখানে রমণী সংসারাশ্রম প্রবেশ না করিয়া পণ্ডিতা হইবার উদ্দেশে যাবজ্জীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, সেখানেও তাঁহাকে বড় একটা পূর্ণমনোরথ দেখা যায় না *।

---

* অহিফেনসেবক শ্রীলশ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অহিফেনের নেশায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সে মালা কখন আধখানার বেশী দেখেন নাই। তবে সাক্ষী নেশাখোর, কত দূর মাতব্বর ঠিক করা সহজ নয়।

কিন্তু শকুন্তলার স্ত্রীরত্নোপযোগিনী বুদ্ধি যাহা আছে তাহা ঠিক পুরুষের বুদ্ধির মতন নয়। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তি-মূলক। শকুন্তলার বুদ্ধি সে রকমের নয়। আশ্রমের নিভৃতপ্রদেশে দুষ্মন্ত যখন তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করেন তখন তিনি বারম্বার তাঁহাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে স্বজন এবং গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আমি আত্মসমর্পণে অক্ষম। জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন যে, গুরুজনকে না জানাইয়াও তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা সে যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিলেন না, তথাপি গুরুজনের নাম করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। যিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত ঠিক মীমাংসা করেন নাই; ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা ঠিক মীমাংসা করিয়াছিলেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই;—দুষ্মন্ত বিচারশক্তি সহকারে ঐতিহাসিক প্রথা ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন; শকুন্তলা উন্নতমনা ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীরত্নের নৈসর্গিক সৎপ্রবৃত্তির বলে মীমাংসা করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের মীমাংসা বিচারশক্তিমূলক; শকুন্তলার মীমাংসা উন্নতহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। অনেক প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দার্শনিক এখন বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিচারমূলক; রমণীর জ্ঞান রমণীহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'লিবর্টি' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় এই কথা এক রকম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা এই কথার একটি প্রমাণ।

শকুন্তলাচরিত্রের সমালোচনায় আমরা যাহা যাহা পাইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ--

১। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ; রমণীর শরীর কোমল।

২। পুরুষ শারীরিক বলে কষ্টসহিষ্ণু; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর হৃদয়ের অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম।

৪। পুরুষ জ্ঞানে এবং শারীরিক বলে রমণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রমণী হৃদয়ের বলে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণবিশিষ্ট; রমণীচরিত্র গভীরতাগুণবিশিষ্ট। পুরুষের অন্তর্লীনতা, বাহ্যানুভূতি এবং বাহ্যবিলীনতা কম; রমণীর অন্তর্লীনতা, বহ্যানুভুতি এবং বাহ্যবিলীনতা অপরিমেয়।

৫। রমণীর আধ্যাত্মিকতা পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা গভীর। কিন্তু পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন; রমণীর আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে জড়জগৎসাপেক্ষ।

৬। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র।

৭। রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্ব্বল হইয়াও বলিষ্ঠা, শ্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধিমতী হইয়াও বিচারশক্তিহীন, আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ। জগতে রমণীর ন্যায় রহস্য আর নাই।

স্ত্রীপ্রকৃতির এত উজ্জ্বল, প্রশস্ত এবং প্রগাঢ় চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোন নাটকে নাই।

একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এত বড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাটককারদিগের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্পপ্রতিভায় সেক্সপায়রও তাঁহার সমকক্ষ নন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা।

যে পুরুষ এবং যে রমণীর ইতিহাস লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক, যাহাদের অদৃষ্টপট অভিজ্ঞানশকুন্তল-রচয়িতা কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে দেখা হইয়াছে। সে পুরুষ পুরুষচরিত্রের আদর্শস্বরূপ এবং সে রমণী রমণীকুলের উচ্চপ্রতিমা তাহা দেখা হইয়াছে। দুইটি ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্নভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে শক্তির গুণে সেই দুই ভিন্ন জগৎ ভিন্নতাসত্ত্বেও এক হইয়া গেল, ভিন্ন পথ ছাড়িয়া একপথে চলিতে লাগিল, সে শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ এখনও দেখা হয় নাই। সে শক্তির নাম প্রেম। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রেমতত্ত্ব বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরীক্ষা অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের মনের এক অংশের দ্বারা অপর অংশের পরীক্ষা। সে মনের এক অংশ দেখিয়াছি; এখন অপর অংশ দেখিতে হইবে। সে মনের সমস্ত দেখা হইয়াছে, কেবল রিপূন্মত্ততা দেখা হয় নাই। এখন সেই রিপূন্মত্ততার প্রকৃতি এবং পরিমাণ দেখাইব।

আশ্রমপ্রবেশকালে দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়াতে তিনি ভাবিলেন—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র ॥

ইহার অর্থ এইঃ—এই আশ্রমপদ শান্তিময়। এমন শান্তিময়স্থানে আমার বাহু স্পন্দিত হইল, ইহার ফল কি হইতে পারে ; এখানে ত স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা নাই। অথবা এমন হইতে পারে যে, ভবিতব্যের বলে সকলস্থানেই স্ত্রীলাভ সম্ভব। দুষ্মন্ত ধার্ম্মিক ; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। শাস্ত্র স্মরণ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভের কথা মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এ বিস্ময়ের কারণ কি ? এ বিস্ময়ের কারণ—'শান্তমিদমাশ্রমপদং।' অর্থাৎ, স্থানটি শান্তিময় তাপসাশ্রম বলিয়া তাঁহার বিস্ময়। সংসারাশ্রমবাসী সংসারধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের বাসস্থান হইলে তাঁহার এ বিস্ময় হইত না। এ সকলই সম্ভব। কিন্তু এ বিস্ময়ের আরও একটু অর্থ আছে। তাহা "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র" এই কয়টি কথায় প্রকাশ। এ কথার অর্থ এই—স্ত্রীলাভ হইলে দুষ্মন্ত সুখী বই অসুখী হন না ; স্ত্রী সত্ত্বেও দুষ্মন্ত পুনরায় স্ত্রীলাভ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন। শুধু হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ বলিয়া যে তিনি এইরূপ ভাবিলেন তা নয়। কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয় না হইলে তিনি বোধ হয় এইরূপ ভাবিতেনঃ—"এ কি ! আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে কেন আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হয় ? ইহার কি আর কোন অর্থ থাকিতে পারে ? জানি না দেবতাদিগের কি অভিপ্রায়।" কিন্তু তিনি সে রকম ভাবিলেন না। কেবল তাপসাশ্রম বলিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয়।

তার পর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইল, তাহাও তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তার এবং রূপানুরাগের ফল। সে ভাব এই—

> “শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
> দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

যদি সামান্য আশ্রমবাসিনীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে দুর্লভ হইল, তবে যে দেখিতেছি উদ্যানলতা বনলতার কাছে পরাজিতা। অলোকসামান্যরূপরাশি দেখিলে লোকে চমৎকৃত হয়, মুগ্ধ হয়, মন্ত্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়, মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, অথবা উচ্ছ্বাসময় স্তুতিবাক্য নির্গত হয়। দুষ্মন্তের সে সকল কিছুই হইল না। তিনি তাপসবালাদিগের রূপরাশি দেখিয়া আপনার রূপসীদিগের নিন্দা করিলেন। আমরা এইরূপ বুঝি যে, যে পুরুষ বা রমণী অন্য স্ত্রী অথবা অন্য পুরুষ দেখিয়া আপনার পত্নীর অথবা আপনার পতির নিন্দা করে, তাহার ‘স্বভাব’ বড় ভাল নয়। বকুলতলায় সুন্দরকে দেখিয়া সে সকল কুলকামিনীরা আপন আপন পতির নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কেহ কখন ভাল বলে নাই। যাহাদের ভোগলালসা একান্ত বলবতী, তাহারাই উপভোগ্য বস্তুর তুলনা করিতে ভালবাসে। দুষ্মন্তের ভোগলালসা যে বড়ই প্রবল এবং সে জন্য তিনি যে একটিমাত্র ভোগ্যবস্তুতে পরিতুষ্ট নন, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া

দুষ্মন্ত একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন এমন সময় এই গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন—

> অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং।
> কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিস্মুমরিদো সি ণং কহং॥

হে মধুকর! তুমি মধুর লোভে লালায়িত হইয়া চূতমঞ্জরীকে সেই ভাবে চুম্বন করিলে, এখন কেবল কমলের সহবাসে নির্বৃত হইয়া বল দেখি কেমন কোরে সেটিকে একেবারে ভুলিলে?

মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গানটির অর্থ কি? দুষ্মন্ত বলিলেন—

> সকৃত্কৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।
> তদস্যা দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি।
> সখে মাধব্য মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্ত উপভোগসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত। তিনি একটি ভোগ্যবস্তু লইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নূতন ভোগ্যবস্তুর পক্ষপাতী। এই নিমিত্তই মহাকবি তাঁহাকে অগাঢ়প্রণয়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শকুন্তলার চিত্রদর্শনকালে বসুমতীর ভয়ে তাঁহাকে সেই চিত্র লুকাইতে দেখিয়া সানুমতী ভাবিতেছেন—

> অন্নসংকন্তহিঅও বি পঢমসংভাবণং অবেক্খদি।
> সিঢিলসোহদো দাণিং এসো।

ইনি অন্যের প্রেমে তদ্গতচিত্ত হইয়াও পূর্ব্বপ্রণয়ের সম্মান রাখিতেছেন। এক্ষণে বসুমতীর প্রতি ইহাঁর প্রণয় শিথিল হইয়াছে।

শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে পর মাধব্য পরিহাস করিয়া বলিল যে, যাহার অন্তঃপুর স্ত্রীরত্নে পরিপূর্ণ, তাহার

এরূপ নূতন অনুরাগ কেমন—না, যে ব্যক্তির মিষ্ট খর্জ্জূর খাইয়া অরুচি হইয়াছে, তাহার তেঁতুলের প্রতি অনুরাগ যেমন। তাহাতে দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন যে, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে তাহা হইলে এমন কথা বলিতে না। কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে মাধব্যের পরিহাস বড় একটা পরিহাস নয় এবং সে পরিহাসের অর্থও যা, দুষ্মন্তের প্রতিবাদের অর্থও তাই।

ফলতঃ দুষ্মন্তের রূপতৃষ্ণা এবং ভোগলালসা অতিশয় বলবতী। সে ভোগলালসার আধিক্য দেখিলে তাঁহাকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি শকুন্তলাকে পরিণীতা ভার্য্যা বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধপীড়িত হইয়াছেন বলিয়া ঋষিকুমারদিগের অপমান করিতেছেন। তথাপি সেই শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্তরূপরাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্ ।
ভ্রমর ইব বিভাতেঃ কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ ॥

এই অক্ষত রূপরাশি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আমি কি হাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছি? কই মনে ত হয় না। ভ্রমর যেমন মাচ্ছন্ন কুন্দপুষ্পটি ভয়ে ভোগ করিতেও পারে না, আবার ছাড়িতেও রে না, তেমনি আমিও ফাঁপরে পড়িলাম।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে দুষ্মন্তের অসাধারণ

চিত্তসংযমশক্তি না থাকিলে তিনি কণ্বের পবিত্র তপস্যাশ্রমের অবমাননা করিয়া ফেলিতেন। এখন বোধ হয় কথাটি অত্যুক্তি বলিয়া কাহারও সংশয় থাকিবে না। রূপবতী রমণী দেখিলে দুষ্মন্ত লালসায় অধীর হইয়া পড়েন। কেবল উন্নতশিক্ষা, উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান এবং অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি তাঁহাকে ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত করে!

শকুন্তলা রূপবতী—রূপবতীর মধ্যে রূপবতী। তাহাতে আবার তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে ভাব প্রথমে অস্ফুট। "দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ," এই তুলনায় সেই ভাবের প্রথম অস্ফুট স্ফূর্ত্তি। এ রকম তুলনা নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ। যাহার সুন্দরী রমণী আছে সে যদি কোন নূতন রমণী দেখিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া নূতন রমণীকে প্রাধান্য দেয়, তাহা হইলে সেই তুলনাকে নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হয়। যেখানে নূতন বস্তুর তুলনায় পুরাতন বস্তু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেই খানেই নূতন বস্তুতে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ তুলনায় স্পৃহাসূচক কিছুই নাই। এ তুলনা কেবল স্পৃহার পূর্ব্বগামী মানসিক অবস্থাব্যঞ্জক। তার পর দুষ্মন্ত শকুন্তলাসম্বন্ধে যাহা ভাবিলেন, তাহাও স্পৃহাসূচক নয় কিন্তু তাহাতে স্পৃহার আভাস আছে। তিনি ভাবিলেন—

কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা।
অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

ইহার মর্ম্ম এই যে এমন কোমলাঙ্গীকে কঠিন আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্ব অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কোমল নীলোৎপল পত্রের দ্বারা কঠিন শমীবৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব, এই কোমলাঙ্গীর দ্বারা সেই কঠিন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

তাপসাশ্রমে তপস্বিকন্যাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের ন্যায় চিত্তসংযমক্ষম ধর্ম্মবীরের মনে একেবারে বলবতী স্পৃহার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুষ্মন্ত স্ত্রীপ্রিয়। 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ' এই তুলনাতেই তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তার প্রকাশ। তবে যখন তিনি শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যার অযোগ্যা বলিয়া ভাবিলেন, এবং কণ্বকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার নিন্দাবাদের মূলে কিঞ্চিৎ আত্মদৃষ্টি নিহিত আছে। মানুষ যখন দুর্লভ অথবা এক অবস্থাপন্ন বস্তুকে সুলভ অথবা অন্য অবস্থাপন্ন করিতে চায় তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সেই ইচ্ছার মূলে সেই বস্তুপ্রাপ্তির স্পৃহা নিহিত আছে। যাহার কোন দূরস্থিত বস্তু পাইবার স্পৃহা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে এই বস্তুটী নিকটে থাকিলে ভাল হয় এবং ইহার নিকটে থাকাই উচিত। যাহার কোন উদ্যানস্থিত পুষ্প লইবার ইচ্ছা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে বড় মানুষের বাগান সাধারণের ক্রীড়াস্থল হওয়া উচিত। যাহার কোন অন্তঃপুরস্থিতা সুন্দরী রমণীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় সে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হয় এবং 'জেনানা সিস্‌টেমের' নিন্দা করিয়া থাকে। দুষ্মন্তের নিন্দাবাদের অর্থও সেই রকম। তাঁহার মনে এখন স্পৃহার

উদ্রেক হইয়াছে। তার পর তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে কণ্বের অভিপ্রায় যাহাই হউক, শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ের মানসিক ভাব ঠিক তপস্বিকন্যার মতন নয়। তিনি এই কথোপকথন শুনিলেন—

শকু। সহি অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদ ক্ষি সিঢ়িলেহি দাব ণং।

অন। তহ।

প্রিয়। এত্থ পওহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ।

শকুন্তলা বলিলেন—প্রিয়ম্বদা আমার বুকের বল্কল অতিশয় আঁটিয়া বাঁধিয়াছে, অতএব, অনসূয়ে, তুমি এটা একটু আল্গা করিয়া দেও। প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন—তোমার নিজের যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে, তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে?

দুষ্মন্তের মন যাহা চায় এ ত তাই। তপস্বিকন্যারা আশ্রমধর্ম্মপ্রতিপালনে নিযুক্ত; কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ও তাঁহাদের মনে স্থান পাইয়া থাকে। তাঁহারা যৌবনের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন এবং যৌবনের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। এ সব দেখিয়া শুনিয়া স্পৃহাবান্ দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা কমিয়া স্পৃহাজনিত অভিনিবেশ বাড়িয়া উঠিল। তিনি শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তপরে শকুন্তলাকে কেশরবৃক্ষমূলে কিঞ্চিৎ হেলিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন এই কেশরবৃক্ষটীর একটি লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। তপস্বিকন্যাদিগের মানসিক

অবস্থা আরও প্রকাশ পাইল। দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা আরও কমিয়া গেল; তাঁহার স্পৃহাবিচলিত মন আরও বিচলিত হইল; তিনি সেই বর্দ্ধিতস্পৃহার বলে শকুন্তলার ওষ্ঠ, বাহু, প্রভৃতি এক একটি অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

অনুরাগ যত বৃদ্ধি হয়, লোকে অনুরাগের বস্তু ততই তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। লোকে যখন কোন বস্তুর প্রতি-অংশে সৌন্দর্য্য দেখে, তখন বুঝিতে হয় যে তাহাদের মন সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুষ্মন্তের মনও এখন শকুন্তলার প্রতি প্রবল-অনুরাগপূর্ণ। শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় অনসূয়ার মুখে শুনিলেন যে শকুন্তলা নিজে বৃক্ষের সহিত লতার বিবাহ দিয়া থাকেন—কোন বৃক্ষের পত্নী করিয়া দেন, কোন লতার পতি করিয়া দেন।

হলা শউন্তলে ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদনামহেআ বনজোসিণি ত্তি ণোমালিআ ণং বিস্সুমরিদা সি।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন ঃ—

তদা অত্তাণং বি বিস্সুমরিস্সং। (লতামুপেত্যাবলোক্য চ) হলা রমণীয়ে কৃখুকালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅকৃখমো সহআরো।

সখি, রমণীয় সময়েই এই লতা ও পাদপের মিলন হইয়াছে। দেখ, বনজ্যোৎস্না অঙ্গে নবকুসুমের যৌবন আর এই সহকার তরু নবপল্লবধারণ করিয়া সম্ভোগসুখের কেমন উপযুক্ত হইয়াছে।

এতক্ষণ দুষ্মন্ত প্রিয়ম্বদার মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া শকুন্তলার মনের ভাবও অবশ্য বুঝিতেছিলেন। কিন্তু এখন স্বয়ং শকুন্তলার মুখে অনেক কথা শুনিলেন এবং শকুন্তলা কি করিতে ভালবাসেন তাহাও জানিলেন। জানিলেন যে শকুন্তলা বৃক্ষ এবং লতার মধ্যে বিবাহ দিতে ভালবাসেন এবং দেখিলেন যে তিনি নবমল্লিকা এবং সহকারের মিলন দেখিয়া তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ ভাবিয়া পরমহর্ষোৎফুল্ল। আবার দুষ্ট প্রিয়ম্বদা তখনি অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিল, যে শকুন্তলার উপযুক্ত পতিলাভের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া পতিপ্রাপ্তা বনজ্যোৎস্নার প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। এবং শকুন্তলা সেই কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—তোমার নিজের বুঝি সেই ইচ্ছা হইয়াছে। শকুন্তলার মানসিক অবস্থার বিষয় জানিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তাঁহার মন এখন মিলনকল্পনাপূর্ণ; তাঁহার ভাবনা এখন মিলনের; তাঁহার জীবন এখন স্বপ্নময় এবং সে স্বপ্ন নবপ্রস্ফুটিত যৌবনের অপরিস্ফুট সঙ্গীতে সঙ্গীতময়। সে সঙ্গীত দুষ্মন্তের কর্ণে বাজিল। তাঁহার লালসা মিলনকামনায় পরিণত হইল। শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তিনি তখনি বিবাহসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু শকুন্তলার মন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রধান আশঙ্কা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহার মন এখন উৎসাহপূর্ণ। তিনি শকুন্তলার জাতি নির্ণয় করিবেন বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। লালসার বস্তুকে ঈপ্সিত অবস্থাপন্ন বুঝিতে পারিলে লোকে তাহা অধিকার করিবার জন্য সাহস

এবং ব্যগ্রতাসহকারে উপায় চিন্তা করিয়া থাকে। দুষ্মন্ত এতক্ষণে শকুন্তলার সহিত অধিকারের ভাব সংযোগ করিলেন। তার পর শকুন্তলাকে ভ্রমরতাড়না হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপসবালাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা কোন প্রভাবশালী পুরুষবরকে দেখিলে ক্ষুদ্রবালিকার মনে যে চকিতের ভাব হইয়া থাকে, তাহা শমিত হইবার পরেই শকুন্তলা মনোবিকার অনুভব করিলেন ঃ—

কিং ণু ক্‌খু ইমং পেক্‌খিঅ তপোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅ ম্হি সংবুত্তা।

ইহাঁকে দেখিয়া আমার তপোবনবিরোধী মনোবিকার জন্মিল কেন?

ক্ষুদ্র হরিণী একেবারে ব্যাধশরাহত। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার মনের ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা তাঁহাদের কাছে এবং দুষ্মন্তের কাছে লুকোচুরি আরম্ভ করিলেন। প্রিয়ম্বদা কি অনসূয়া দুষ্মন্তসম্বন্ধে তাঁহার মনের মতন কথা বলিলেই তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সতৃষ্ণভাবে অথচ যেন চোরের ন্যায় ভয়ে ভয়ে দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিলেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছেন। শকুন্তলাসম্বন্ধে দুষ্মন্তের এখন যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহার কেবল ইহাই জানা আবশ্যক যে শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না। তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়কন্যা। এবং প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে বলিয়া দিল যে কণ্ব শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে অভিলাষী। কথাটি শকুন্তলার খুব মনের মতন হইল। কিন্তু

তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে আর দুইটি গাছে জল দিবার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। দুষ্মন্ত তাঁহার শ্রমকাতরতায় কাতরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঋণের বিনিময়ে নিজের অঙ্গুরীটি প্রিয়ম্বদাকে দিলেন। প্রেমের স্নেহময়ী মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। অঙ্গুরীটি পাইয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শকুন্তলার এখন চলিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। তিনি রাগ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—

কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা।

আমাকে তাড়াইয়া দিবারই বা তুমি কে আর ধরিয়া রাখিবারই বা তুমি কে?

প্রথম প্রেমসঞ্চারের সময় রমণী অধিকতর লজ্জাশীলতাহেতু এইরূপ লুকোচুরিই করিয়া থাকে। রমণী শীঘ্র মনের কথা বলিতে পারে না। রমণীর অস্তিত্ব হৃদয়গত। যে যত হৃদয়াধীন, বাহ্য অভিব্যক্তি তাহার তত কষ্টকর। সে কষ্ট রমণীমণ্ডলে লজ্জারূপধারণ করিয়া লুকোচুরি প্রভৃতি রমণীয় কুটিলতায় অভিব্যক্ত হয়। যেখানে রমণী পুরুষের সহিত বেশী মিশামিশি করে, সেখানে রমণীর বাহ্য অভিব্যক্তি কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য রমণীর প্রেমের ইতিহাস অথবা বলিতে গেলে রমণীর সমস্ত ইতিহাস, ইউরোপে এক রকম, এসিয়ায় কিছু ভিন্ন রকম। শকুন্তলা হিন্দুরমণী। সুতরাং তাঁহার প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু বেশী। এ লজ্জাশীলতা এবং লুকোচুরির আরো একটু তাৎপর্য্য আছে। যে দেশের ভাবে এবং শিক্ষায় শরীর

আত্মার তুলনায় অতি অপবিত্র, সে দেশে শারীরিকসম্ভোগসূচক প্রসঙ্গমাত্রই কিছু লজ্জা উৎপাদন করিয়া থাকে। এবং সেই নিমিত্তই সে দেশে প্রেমের সহিত লুকোচুরির কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ইউরোপের ভাব এবং শিক্ষা এ রকমের নয়—সেখানে লোকে ভারতের ন্যায় আত্মার সহিত দেহের অত তুলনা করে না এবং দেহটাকে অত অসার, অপদার্থ, অপকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করে না; এবং সেই জন্য ইউরোপীয় কাব্যের নায়িকাগণ প্রেমপ্রসঙ্গে এক রকম প্রগল্‌ভা বলিলেই হয়। কিন্তু ভারতের এই ভাব এবং এই শিক্ষা এবং শকুন্তলাও ভারতরমণী এবং ব্রহ্মসেবানিরত তাপসবালা। সেই জন্যই দুষ্মন্তের নিকট হইতে গমনকালে তাঁহার পায় কাঁটা ফুটিল এবং তাঁহার বস্ত্র গাছের ডালে আট্‌কাইয়া গেল। তখন দুষ্মন্তও যেমন তাঁহাতে মজিয়াছেন তিনিও তেমনি দুষ্মন্তে মজিয়াছেন। তবে তিনি এক রকমে মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত আর এক রকমে মজিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহাকে দেখিবামাত্র মজেন নাই। দুষ্মন্তের প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে; সুতরাং সে প্রেম একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইনি যে দেখিতে পাই তপস্বিকন্যা, ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মণকন্যা—দুষ্মন্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিঘ্নকল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় কোন কল্পিত বিঘ্ন প্রকৃত বিঘ্ন বলিয়া জানিতে পারিলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা সে রকম কোন বিঘ্নকল্পনা করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মন একেবারেই বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জ্ঞানের

কার্য্য কিছুই হইল না। বোধ হয় সে প্রেমের কোন বিঘ্ন ঘটিলে সেই প্রেমানলেই তিনি ভস্মীভূতা হইতেন। রমণী হৃদয়-প্রধান বলিয়াই দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চারের এই ভিন্ন প্রণালী।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা পরস্পরে এমনি মুগ্ধ, যে কাহারও কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ছাড়িয়া থাকিতে হইল। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন; শকুন্তলাও আশ্রমকুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই বিচ্ছেদের পর যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মিলন হইল, সে পর্য্যন্ত দুই জনের ইতিহাস কতকটা একরকম কতকটা ভিন্নরকম। উভয়েই পরস্পরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই সেই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া উভয়েই শীর্ণ, দুর্ব্বল, আহারনিদ্রা-বর্জ্জিত।

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ॥

ভাবিয়া ভাবিয়া শকুন্তলার ত এই দশা হইয়াছে। দুষ্মন্তেরও তাই ঘটিয়াছে। প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিতেছেন :—

জং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ দিট্‌ঠিএ সূইদাহিলাসো ইমাইং দিঅহাইং পজ্জাঅরকিসো লক্‌খীঅদি।

এবং দুষ্মন্ত নিজে এই কথা বলেন :—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।

অনতিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে ॥

এ কি রকম চিন্তা ? দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, শকুন্তলার সম্বন্ধে তত সহজ নয়। কারণ দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ চিন্তার বাহ্যস্ফূর্ত্তি আছে, শকুন্তলার সম্বন্ধে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াই নিজসখা মাধব্যের কাছে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শকুন্তলা নিজসখীদ্বয়ের কাছে কোন কথা বলিলেন না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপের কথা মনে করিতে লাগিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া শকুন্তলা কি করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন ; আবার কি রকম করিয়া শকুন্তলার সহিত দেখা হইবে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যালোচনাই দুষ্মন্তের মনে প্রবল। সে পর্য্যালোচনার প্রকৃতি এই :—

"মনে করিলেই প্রিয়াকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মন তা বুঝে না। সে সদা তাঁহারই অনুরাগদর্শনে উৎসুক। এখনও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অনুরাগ দর্শন করিয়া একপ্রকার আনন্দে উন্মত্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হুঃ এইরূপে প্রণয়ী ব্যক্তি প্রতারিত হয়। সে ভাবে তাহার আপনার মনে যে যে ভাবের উদয় হইতেছে তাহার প্রিয়জনের মনেও অবিকল সেই সকল ভাবের উদয় হইতেছে। তিনি অন্য দিকে যদৃচ্ছায় নয়ননিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি ভাবিয়াছি সেটী আমাকে দেখিয়াই। তিনি গুরু নিতম্বের ভরে মন্থরভাবে

গমন করিয়াছেন, আমি মনে করিয়াছি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার গতি বিলাসে অলস হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আটকাইলে তিনি সখীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন, সেটীও আমার মনে হইল যে আমারই জন্যে। কামী ব্যক্তি আপনার ভাবে ভোর হইয়া সকলি আপনার বলিয়া দেখে।"

এ পর্য্যালোচনার অর্থ—সন্দেহ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়াও বুঝে না, নিশ্চিন্ত হইয়াও সন্দিহান হয়, আশ্বস্ত হইয়াও প্রতারিত মনে করে। শকুন্তলাকে জর্জ্জরিতাবস্থায় দেখিয়া দুষ্মন্ত একবার সন্দেহ করিয়া পরক্ষণেই নিশ্চয় বুঝিলেন যে মনোবিকারই এ অবস্থার কারণঃ—

বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে। অথবা কৃতং সন্দেহেন।

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো
র্নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু ॥

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই যখন প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলাকে তাঁহার পীড়ার কারণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন শকুন্তলার উত্তর প্রতীক্ষায় দুষ্মন্ত ভয়াকুলিত হইয়া পড়িলেন, চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি ॥

যাহারা চিরদিন ইহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী সেই সখীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইনি এখন আর মনস্তাপের কারণটী লুকাইতে পারিবেন না। ইনি তৎকালে বারংবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিলেও এই সময়টা (ইনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য) আমার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

শুধু প্রেম কেন, সকল বিষয়েই মানুষ যাহার বেশী অভিলাষী হয় তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ও সন্দেহসংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শকুন্তলার বোধ হয় এ রকম সন্দেহ হয় নাই। এ রকম সন্দেহ যুক্তি প্রয়োগের ফল। রমণী হৃদয়সর্ব্বস্ব। সে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিলে রমণী হৃদয়ের বস্তু পাইবার জন্যই ব্যাকুল হন, পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচনা করেন না। যদি সে বস্তু পান, ভালই; নচেৎ চিরদুঃখিনী হইয়া থাকেন, অথবা শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যান। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার অনুরোধে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়কে বলিলেন ঃ—

তং জই বো অণুমদং তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পনিজ্জা হোমি।
অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং।

অতএব তোমাদের যদি মত হয় ত যাতে সেই রাজর্ষি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তাহার উপায় কর, নতুবা আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ কর।

তবে শকুন্তলার একটি সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি দুষ্মন্তের যোগ্যা কি না। প্রিয়ম্বদা যখন তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ—

চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং।

আমি ভাবিতেছি। কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

কিন্তু এ সন্দেহ প্রকৃত যুক্তিমূলক সন্দেহ নয়। এ সন্দেহের নাম ভয়। যাহার অন্যের ইচ্ছার উপর জীবন এবং মৃত্যু নির্ভর করে, তাহার সেই ইচ্ছা জানিবার সময় এইরূপ ভয় হইয়া থাকে।

প্রেমসঞ্চারের পর মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যে অবস্থা আমরা বর্ণনা করিতেছি তাহার আর একটী লক্ষণ যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার দুইটী কারণ—সন্দেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা। তন্মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল কারণ। এই কারণ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই বর্ত্তমান। উভয়েই জর্জ্জরিত দেহ। উভয়েই উত্তপ্তশোণিত। উভয়েই জ্বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এ জ্বালায় দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির; শকুন্তলা প্রায় চেতনাশূন্য, বিকলাঙ্গ, উত্থানশক্তি-রহিত। দুষ্মন্ত ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রতিনিশ্বাসে প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন ঃ—

“(নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) সেই তাপসতনয়া যে পরাধীনা ইহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং তপস্যার কিরূপ উগ্রপ্রভাব তাহাও বিলক্ষণ জানি, তথায় আপন ইচ্ছায় কিছুই করিবার শক্তি নাই। তথাপি সেই দুর্লভ বস্তু হইতে হৃদয়কে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না। (মদনপীড়া প্রকাশ করিয়া) হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! আপনি এবং চন্দ্র, আপনারা উভয়ে নিজ কোমল ও বিশ্বস্তমূর্ত্তিতে প্রলোভিত করিয়া প্রণয়পীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। আপনার শর সুকোমল কুসুমে রচিত এবং চন্দ্রের রশ্মি শীতল সুধাময়, কিন্তু আমার নিকটে ত ইহার সম্পূর্ণ বিপ-

রীত দেখিতেছি। কারণ চন্দ্র হিমগর্ভ রশ্মিদ্বারা অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন আর আপনিও কুসুমশরকে বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন। তপস্বিগণ যজ্ঞকার্য্যের অবসানে আমাকে গমনের অনুজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ স্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শন ভিন্ন আর শান্তি কোথায় ? এই দারুণ রৌদ্রের সময় শকুন্তলা সখীজনের সহিত প্রায়ই মালিনীতীরস্থিত নিকুঞ্জদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব সেই স্থানেই গমন করি। (গমন করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করত) আহা! এই স্থানটী শীতলবায়ুর সঞ্চারে কি মধুর! আমার অঙ্গ সকল না কি অনঙ্গবহ্নিতে জ্বলিতেছে, তাই এই পদ্মসৌরভপূর্ণ মালিনীনদীর শীতল বাতাসটুকু বারংবার গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বোধ হয় শকুন্তলা এই বেতসলতাবেষ্টিত লতামণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন, কেন না, ইহার এই সিকতাময় দ্বারদেশে নূতন পদচিহ্ন সকল পতিত রহিয়াছে, আর এই পদচিহ্ন সকলের পূর্ব্বভাগ উচ্চ রহিয়াছে আর পশ্চাদ্ভাগ জঘনভরে বালুকায় বসিয়া গিয়াছে। অতএব লতান্তরালে থাকিয়া দেখি। (সেইরূপ করিয়া আনন্দে) আঃ! আমার চক্ষু জুড়াইল।”

যাহার অন্তঃপুর সুন্দরী রমণীতে পরিপূর্ণ তাহার এরূপ অবস্থা দেখিলে কে না বলিবে যে তাহার রিপু যথার্থই দুর্দ্দমনীয়, আসঙ্গলিপ্সা কিছুতেই মিটিবার নয়। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। এ রকম অবস্থায় মানুষ হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া পড়ে এবং ঘোর অনিষ্টসাধনে সক্ষম হয়।

কিন্তু এ অবস্থার, এ যন্ত্রণার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান অতিশয় তীব্র। যে চন্দ্ররশ্মি অন্য সময়ে 'খবরে' আসে না, যে শীতল বায়ু অন্য সময়ে গায়ে লাগে না এ যন্ত্রণায় সে চন্দ্ররশ্মি, সে শীতলবায়ু তীব্রভাবে অনুভুত হয়। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজগৎ ভয়ানক প্রভাবশালী! কিন্তু শকুন্তলার যন্ত্রণা এ রকমের নয়। শকুন্তলা মুমূর্ষুর ন্যায় শয্যাশায়িনী। দুষ্মন্তকে দেখিয়া অবধি তিনি যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এক পা নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার বাহ্যিক দৃশ্য মুমূর্ষুর ন্যায় তাঁহার অন্তর বিষম জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে! সে জ্বালা এত প্রবল যে তজ্জন্য তিনি একরকম বাহ্যানুভূতিরহিত। সে জ্বালায় তিনি পদ্মপত্রসঞ্চালিত বায়ু অনুভব করিতে পারেন নাই। সে জ্বালায় বাহ্যজগৎ তাঁহার কাছে অস্তিত্বহীন! সে জ্বালায় একটি কথাও তাঁহার ওষ্ঠস্খলিত হয় নাই। দুই জনের যাতনার দুই রকম আকৃতি। একজন যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায় এবং বাক্যে এবং নিশ্বাসে অগ্নি উদ্গীরণ করে। আর একজন যাতনায় মুমূর্ষুর ন্যায় শিথিলদেহ এবং মৃতের ন্যায় নিস্তব্ধ। দুই জনেই যেন আগ্নেয় গিরি। কিন্তু একটী গিরির গর্ভস্থ অগ্নি সতেজে শিখর ভেদ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং দূরে অদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; আর একটি গিরির গর্ভস্থ অগ্নি শিখর ভেদ করিতে না পারিয়া সেই গর্ভকেই বর্দ্ধিতবিক্রমে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এখানেও দেখিতেছি যে পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষের অভিব্যক্তি আছে, রমণীর অভিব্যক্তি নাই। এই

মূলীভূত বৈপরীত্য কালিদাস যেমন আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আর কোন কবি তেমন দেখান নাই।

তার পর মিলন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার সম্মুখে দুষ্মন্ত বলিলেন :—

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥

যদিও আমি বহুপত্নী গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু এখন হইতে দুইটী বস্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল—একটী আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য আর একটী তোমাদের সখী শকুন্তলা।

সম্মান প্রকৃত প্রেমের একটী প্রধান উপাদান। দুষ্মন্তের প্রেমের সেই উপাদান এখন ব্যক্ত হইল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সরিয়া গেলেন। তখন রিপূন্মত্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন :—

পোরব রক্খ অবিণঅং মঅণসংতত্তা বি ণহু অত্তণো পহবামি।

পৌরব! শিষ্টাচার ভঙ্গ করিও না। আমি লালসাবতী সত্য, কিন্তু আমার নিজের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই।

এই কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের ইতিহাস বলিয়া এইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকেও তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম! শকুন্তলা বুঝিলেন না। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে বলিলেন যে আমি তোমাকে এখন ছাড়িব না ; ছাড়িব কখন, না—

অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥

যখন তোমার কোমল অক্ষত অধরের মধুপান করিয়া আমার খরতর পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা তাঁহারই ন্যায় ভোগতৃষ্ণাতুরা হইয়াও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লজ্জাশীলার লজ্জাশীলতা এখনও প্রবল; জ্ঞানহীনার জ্ঞান এ সময়েও পরিষ্কার। কিন্তু সংযতচিত্ত দুষ্মন্ত একেবারে বিহ্বলমতি; জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। যখন বাহ্যজগৎ ভুলিলে বিষম অনিষ্ট ঘটে তখন রমণী বাহ্যজগৎ ভুলে না, পুরুষ ভুলে। অবশেষে দুষ্মন্তের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। রিপু জয়ী হইল। ন্যায়পরায়ণ সংযতচিত্ত ধর্ম্মবীরের পদস্খলন হইল। সে পদস্খলনের কারণ সেই ধর্ম্মবীরের প্রবল রিপু। দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নয় এবং শকুন্তলার আত্মসমর্পণক্ষমতা নাই। শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার অতুল রূপের বর্ণনা করিলে পর মাধব্য তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যত শীঘ্র পারেন সে রূপবতীকে দখল করিবার চেষ্টা করুন, বিলম্ব করিলে হয় ত সে কোন চিক্কণমস্তক ঋষির হাতে পড়িবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

> পরবতী খলু তত্রভবতী।
> ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

তিনি পরাধীনা এবং তাঁহার গুরুজন গৃহে নাই।

এখন শকুন্তলা স্বয়ং সেই কথাই বলিতেছেন।* কিন্তু এখন তিনি সে কথা না শুনিয়া শকুন্তলাকে বুঝাইতেছেন

যে তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম, তাঁহার গুরুজনের সম্মতি লইবার আবশ্যকতা নাই। এ রহস্যের অর্থ—দুর্দ্দমনীয় রিপু। শকুন্তলাকে কাছে পাইয়া দুষ্মন্ত তাঁহার উন্নত নীতি, উন্নত বুদ্ধি, উন্নত বিচারশক্তি, অসাধারণ চিত্তসংযমক্ষমতা সকলই হারাইলেন। প্রখর রবি মেঘাচ্ছন্ন হইল।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি কি রকম ভাব তাহা দেখিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ। তিনি ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া কণ্বের আশ্রম হইতে নিজ রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। কিন্তু ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের উচ্ছেদ হয় নাই। শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছেন—সে হৃদয়ে শকুন্তলা-প্রেম জীবন থাকিতে উচ্ছিন্ন হইবার নয়। অঙ্গুরীয় পুনদর্শন করিয়া দুষ্মন্ত যে ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করেন তাহাই তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের গাঢ়ত্বের পরিচয়। কিন্তু মহাকবি সে পরিচয় অপেক্ষা একটি সহস্রগুণে আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাস্মৃতি হারাইয়াছেন। হারাইয়া একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি মনোহর গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন। করিয়া তাঁহার মন এক অলৌকিকভাবে গলিয়া গেল। সে ভাব এইঃ—

কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

কই আমার ত কোন ইষ্টবস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে এই গীত শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ এত আকুল হইল কেন? অথবা কোন রম্য বস্তু দেখিলে বা কোন মধুর শব্দ শুনিলে সুখের অবস্থায়ও যে মানুষের মন আকুল হইয়া উঠে, সে বোধ হয় তখন পূর্ব্বজন্মের কোন সুদৃঢ় প্রণয়ের বস্তুকে অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করে।

কি কোমল, কি গভীর, কি পবিত্র ভাব! এ ভাবের গাঢ়তা বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! যে বন্ধুত্ব জন্মান্তর-পরিগ্রহেও স্মৃতিপথে থাকে সে বন্ধুত্ব কত পবিত্র, কত গাঢ়, কত মিষ্ট। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শকুন্তলার অস্ফুট স্মৃতি আজিও তাঁহার মনকে এই অলৌকিকভাবে পরিপূরিত করিতেছে। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তচিত্ত আজ শকুন্তলাসম্বন্ধে মহাপ্রলয়গ্রস্ত। কিন্তু সেই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়াও সেই প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রলয়েও সে রকম প্রেমের লয় নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম যথার্থই গাঢ়তম, পবিত্রতম, কোমলতম। কেনই বা সে প্রেম সে রকম না হইবে? শকুন্তলা শুধু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা দুষ্মন্তকে পরাজয় করেন নাই। তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের দ্বারাও তিনি সেই পুরুষপ্রধানকে পরাজয় করিয়াছেন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা যে কয় দিন দম্পতিভাবে কণ্বের আশ্রমে ছিলেন, তাঁহাদের সে কয় দিনের জীবন-প্রণালীর বিষয় মহাকবি কিছু বলেন নাই। সে বিষয়টি তিনি পাঠকের দৃষ্টি হইতে যবনিকাচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। একটি বার মাত্র একটি মুহূর্ত্তের জন্য সেই যবনিকার একটি

পার্শ্ব সরাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া মহাকবি এক আশ্চর্য্য নৈতিক বিপ্লব দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পুরুষপ্রধান, বীরপ্রধান দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে বসিয়া শকুন্তলাময় হইয়াছেন, পুরুষের পৌরুষভাব হারাইয়া রমণীর রমণীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌরবসভায় শকুন্তলা বলিতেছেনঃ—

ণং এক্কস্মিং দিঅহে ণোমালিআ মণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং উদঅং তুহ হত্থে সন্নিহিদং আসি। তক্খণং সো মে পুত্ত কিদও দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও উবট্‌ঠিদো। তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা তস্মিং এব্ব মএ গহিদে সলিলে তেণ কিদো পণও। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্সসদি দুবে বি এত্থ আরণ্ণও ত্তি।

একদিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকামণ্ডপে বসিয়াছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গনামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তবে অগ্রে জলপান করুক ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নিকটে ডাকিলেন, কিন্তু সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকটে আসিল না। অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে সে আসিয়া পান করিল। আপনি তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই জঙ্গলা কি না।

যে দুষ্মন্ত বীরবিক্রমে শাণিতশর হস্তে হরিণ তাড়না করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুষ্মন্ত সেই আশ্রমে বসিয়া একটি বালিকার সহিত বালিকার ন্যায় হরিণের শুশ্রূষা করিতেছেন! কঠিনহৃদয় পুরুষপ্রধান কোমলহৃদয় বালিকা হইয়া পড়িয়াছেন! ক্ষুদ্র বালিকার

হৃদয় সসাগরা পৃথিবীর রাজাকে পরাজয় করিয়াছে! এই নৈতিক পরাজয়ের গুণেই দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম এত কোমল, এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ। সে প্রেম এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিল। এবং সেই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ দুষ্মন্ত হিন্দুপতির পদগৌরব বুঝিয়াও কশ্যপাশ্রমে শকুন্তলার কাছে নতশিরে নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রেম এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে প্রেমের তুলনা নাই, পরিমাণ নাই, সীমা নাই। সে প্রেম একটি আশ্চর্য্য শক্তি। সেই শক্তির গুণেই কোমলতাময়ী শকুন্তলা কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সে প্রেম একটি মন্ত্র। সেই মন্ত্রে আহত হইয়া শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পান নাই। সে প্রেমের একটি প্রধান উপাদান বিশ্বাস। দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া একটী অবধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে হস্তিনাপুরে লইয়া যাইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। গিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিলেন। এ দিকে অবধারিত সময় অতীত হইয়া গেল। অনসূয়া দুষ্মন্তের উপর চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ণ মে উইদেস্সু বি ণিঅকরণিজ্জেসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দাণিং সকামো হোদু জেণ অসচ্চসন্ধে জণে সুদ্ধহিঅআ সহী পদং কারিদা।

কিন্তু শকুন্তলার রাগ হইল না। তিনি পতিকে সন্দেহ

করিলেন না, গালি দিলেন না। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে, সন্দেহশূন্যমনে পুনরায় পতিদর্শনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে বিদায়গ্রহণকালে চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীকে সকাতরে চীৎকার করিতে দেখিয়া তিনি অনসূয়াকে বলিলেনঃ—

> সখি, দেখ, চক্রবাক নলিনী-পত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

এ কথায় রাগ বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। এ স্নেহের কথা, আদরের কথা, হৃদয়ের মিষ্টতার কথা। অবিশ্বাসীর সম্বন্ধে রমণী এমন কথা কয় না। আবার তখনই তাঁহার সখিদ্বয় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে যদি দুষ্মন্ত তোমাকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও। কথাটি শুনিবামাত্র শকুন্তলা একটিবার মাত্র যেন শিহরিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া পথিমধ্যে সেই অঙ্গুরীয়টিই হারাইয়া বসিলেন! প্রেমময়ী সরলা বালা পৃথিবীকে সরলহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা দেখাইলেন। সে হৃদয়ে প্রেমের বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ স্থান পায় না। অগাধ প্রেম বিশ্বাসমূলক। যেখানে অগাধপ্রেম সেই খানেই এই রকম সরলতা। শকুন্তলার প্রেম এত অগাধ, এত বিশ্বাসমুলক, এত সরলতাময় না হইলে, তিনি সখীদ্বয়ের উপদেশ শুনিয়া অগ্রে অঙ্গুরীয়টি বস্ত্রাঞ্চলে আঁটিয়া বাঁধিতেন এবং মধ্যে মধ্যে খুজিয়া দেখিতেন সেটি যথাস্থানে আছে কি না। কিন্তু তিনি তাহা

করেন নাই। বোধ হয় কোন কোন বিজ্ঞ পাঠিকা বলিবেন যে শকুন্তলা বড় বোকা মেয়ে। আমরা বলি যে এমন সুমিষ্ট বোকা মেয়ে জগতের আর কোন কবির কল্পনায় উদ্ভূত হয় নাই। শকুন্তলা অগাধপ্রেমে মুগ্ধ থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও পতিকে অবিশ্বাস করেন নাই এবং পতির নিকটে অন্যায়াচরণ আশঙ্কা করেন নাই। সরলা বালার প্রথম আশঙ্কা পতির কথা শুনিয়া জন্মিয়াছিল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব যখন দুষ্মন্তকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন দুষ্মন্ত বলিলেন ঃ—

কিং চাত্র ভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

ইহাকে কি আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি?

এবং তখনই শকুন্তলা ভাবিলেন ঃ—

হিঅঅং সংপদং দে আসঙ্কা।

এখন আমার হৃদয়ের একটি আশঙ্কার কারণ জন্মিল।

৮ শকুন্তলার প্রেমের আর একটি প্রধান উপাদান সম্ভ্রম। শকুন্তলা যাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে সেই হৃদয়ের পূজ্য দেবতা বলিয়া সম্ভ্রম করেন। দুঃখভাগিনীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখপূর্ণ সময়ে এই পতি-সম্ভ্রম তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত এবং মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিল। পতিকর্ত্তৃক কুলটা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া শকুন্তলা পতিহীনার ন্যায় মলিনবেশে ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল কঠোর ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিয়াছেন। সহসা সেই পতির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইল। কিন্তু দুষ্মন্ত অনুতাপে শীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তখনও তিনি

তাঁহাকে পতি বলিয়া ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দুষ্মন্তের কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তখন তিনি কি করিলেন? 'জেদু অজ্জউত্তো,' আর্য্যপুত্ত্রের জয় হউক, অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিবার পর বাষ্পাকুললোচনার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। শকুন্তলার দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ এখন মুহূর্ত্তসম্বদ্ধ হইয়াছে। যে দুঃখ অনেক বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াছেন, সেই দুঃখ এখন তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ভোগ করিতে হইল। যেন সুদীর্ঘ স্রোতস্বতী সহসা একমুষ্টিপরিমিত স্থলে গুটাইয়া পড়িয়া বিপরীত তেজে উৎসাকারে উঠিতে লাগিল। এ রকম মুহূর্ত্ত একটি ভয়ানক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় রমণী প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি হয় মূর্চ্ছাপন্ন হন, না হয় পতির দৃঢ়তর দেহস্তম্ভের আশ্রয়ে মূর্চ্ছা নিবারণ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ কথার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে পরীক্ষায় শকুন্তলার সে রকম কিছুই হইল না। তিনি আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যসহকারে অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ গাম্ভীর্য্যের মুল পতিসম্ভ্রম। যেখানে সম্ভ্রমের আধিক্য সেই খানেই অসীম শক্তি, অসীম গাম্ভীর্য্য—সেই খানেই দুর্ব্বলতা দেখাইতে লজ্জা হয়, মন আপনিই দৃঢ় এবং মহিমাপূর্ণ হইয়া উঠে। সে শক্তি, সে গাম্ভীর্য্য, সে মহিমা অতীব মনোহর। যখন দেহ এবং মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা তখন যে অটল এবং গম্ভীর হইয়া থাকে সে জগতের একটি প্রধান সৌন্দর্য্য এবং আরাধ্য বস্তু। শকুন্তলা হিন্দুপত্নী বলিয়াই এত অটল, এত গম্ভীর; কেন না হিন্দুপত্নীই পতিকে

শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরম সম্ভ্রমের সহিত ভালবাসেন। হিন্দুপত্নীর হিন্দুপত্নীত্ব কেহ যেন ঘুচায় না! হিন্দুপত্নীকে ইউরোপীয় পত্নীর ন্যায় সাম্যবাদিনী করিলে তাঁহার হিন্দুপত্নীত্ব ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু শুভাদৃষ্টবশতঃ জগতের শুশ্রূষা যে ভাগ্যবতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম তাহার পক্ষে পুরুষ জাতির সম্বন্ধে সাম্যভাব অপেক্ষা সম্ভ্রমের ভাব বেশী উপযোগী এবং উপকারী।

শকুন্তলার হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে হৃদয়ের ভালবাসা অগাধ, বিশ্বাস অগাধ, স্নেহ অগাধ, সম্ভ্রমকারিতা অপরিমেয়, কোমলতা অনির্ব্বচনীয়, সরলতা চমৎকারিণী। সে হৃদয়ের কাছে পুরুষপ্রধান দুষ্মন্ত চিরকালের জন্য পরাজিত। সে হৃদয়ের মৃদুমধুর নিশ্বাসে দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ দুষ্মন্তহৃদয় এক আশ্চর্য্য নৈতিকবিপ্লবে চিরসংস্কৃত। সে হৃদয় জগতের একটী অত্যাবশ্যক মহোপকারী নৈতিক শক্তি। পুরুষজাতির সংস্কার এবং উন্নতির নিমিত্ত সে হৃদয়ের সৃষ্টি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ ; কিন্তু রিপুপরবশ বলিয়া তিনি অধার্ম্মিক নন। তিনি বহুস্ত্রীসত্ত্বেও শকুন্তলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার শকুন্তলার প্রতি আসক্তি যথেচ্ছাচারী দুরাচারের আসক্তি নয়। এ কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। এখনও বলি যে রিপূন্মত্ত দুষ্মন্ত অসাধারণ চিত্তসংযমসহকারে শকুন্তলার জাতিকুল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া শেষে শকুন্তলাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি যে শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পরীক্ষা আরম্ভ হয়—তাঁহার রিপু এবং ধর্ম্মভাবের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে তাঁহার ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়াছিল। ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়া দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে পবিত্র পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিয়াছিল। সে পরিণয়ের অর্থ—ঘৃণাস্পদ কামোন্মত্ত যথেচ্ছাচারীর কদর্য্যবাসনা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ক্ষণিক সম্বন্ধ নয়। সে পরিণয়ের অর্থ—জীবনব্যাপী পবিত্র পতিপত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু সে পবিত্র পরিণয়ের ফল কি হইল ?

সে পবিত্র পরিণয়ের প্রথম ফল—নায়ক নায়িকার যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদ। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া শকুন্তলা

কশ্যপাশ্রমে থাকিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। পতিপ্রাণা পতিহীনার ন্যায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোমল হৃদয়ে বিষম বিচ্ছেদাগ্নি ধারণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়াছিলেন। স্নেহপ্রাণা স্নেহময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্নেহের পদার্থ হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল হাহাকার করিয়াছিলেন। আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজ্ঞী অসহায়া অনাথার ন্যায় বহুকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশতিলক, পৃথিবীর রাজকুলতিলক দুষ্মন্তের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবী সর্ব্বলোকোপেক্ষিতা অধমতমা কাঙ্গালিনীর ন্যায় ধূলিধূসরিত অঙ্গে মাটি হইয়া মাটিতে মিশাইয়াছিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলার বিচ্ছেদে উন্মাদগ্রস্ত। নিরপরাধা সতী-সাধ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুরবাক্যে তাড়াইয়া দিয়া ধার্ম্মিকপ্রধান দুষ্মন্ত অনুতাপে দগ্ধহৃদয়, জীর্ণ, শীর্ণ, আহারনিদ্রাবর্জ্জিত, আকুলপ্রাণ, শোকবিহ্বল।

সে পবিত্রপরিণয়ের দ্বিতীয় ফল—নায়কনায়িকার আত্মীয় বন্ধুগণের যন্ত্রণা। অপমানিত শকুন্তলাকে রাখিয়া গৌতমী, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যান তখন তাঁহারা যে কি বিষম শোকভারে আক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শকুন্তলা তাঁহাদের সকলেরই আদরের বস্তু। আশ্রমপ্রদেশে দুষ্মন্তের অবস্থান কালে শকুন্তলার যে পীড়া হয় তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার যখন গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া সেই নিদারুণ কথা জ্ঞাপন করিলেন তখন যে পবিত্র

ব্রহ্মচিন্তানিমগ্ন ব্রহ্মনামপূর্ণ তপস্যাশ্রম অকিঞ্চিৎকর সংসারাশ্রমের ন্যায় মোহমুগ্ধের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সে কথা শুনিয়া ঋষিকুলপতি কণ্বের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাতই লাগিয়াছিল! শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু—'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্।' আর প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ত কথাই নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া যে কি করিয়াছিল তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। আবার মেনকা কন্যার নিমিত্ত যার পর নাই কাতর এবং শোকাকুল। তিনি কন্যার দুঃখে অস্থির হইয়া দুষ্মন্তের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত সানুমতীকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ যে যেখানে শকুন্তলাকে জানিত এবং ভালবাসিত সেই তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল, শোকসন্তপ্ত। ওদিকে দুষ্মন্তের রাজপুরীও শোকনিমগ্ন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভীত, উৎকণ্ঠিত, শোকাতুর। রাজপুরবাসিনীরাও তদবস্থ। তাঁহার অনুমতিক্রমে চিরপ্রচলিত-বসন্তোৎসব বন্ধ হওয়ায় হস্তিনাপুরের রাজবাটী যেন একটী প্রলয়ঙ্করী ঘটনার ছায়ায় গাঢ়নিমগ্ন—নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরানন্দ!

সে পবিত্র পরিণয়ের তৃতীয় ফল—রাজ্যের অমঙ্গল। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত মহা পরীক্ষায় পড়িয়া রাজকার্য্য ভুলেন নাই। আমরা বলিয়াছি যে সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও আমরা সেই কথা বলি। কিন্তু আরো একটি কথা আছে। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া যখন তাঁহার শকুন্তলার স্মৃতি ফিরিয়া

আসিল, তখন তিনি ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার যে রকম পরিবর্ত্তন হয়, বৃদ্ধ কঞ্চুকী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিলেই চলিবে :—

> রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে।

> তিনি এখন পূর্ব্বের মত মনোহর বস্তুতে প্রীত হন না এবং অমাত্যবর্গকে প্রতিদিন আস্থা প্রদর্শন করেন না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্তের যন্ত্রণা রাজকার্য্যবিভাগেও সম্পূর্ণরূপে ফলশূন্য নয়। অমাত্যগণের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় নয়। রাজা এবং অমাত্যমণ্ডলী উভয়ই ভাল হইলে সে আস্থাভাব আশু অনিষ্ট সাধনে অক্ষম হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে সে আস্থাভাব ভাল রাজ্যেও প্রজাবর্গের অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ অমাত্যবর্গের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মন্দ বই ভাল নয়। সে আস্থাভাব ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও এককালে দোষশূন্য নয়—ঘোর অনিষ্টকারী না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যবিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু দুষ্মন্তের যে শুধু অমাত্যগণের প্রতি কিছু আস্থাভাব হইয়াছিল তা নয়। তাঁহার যন্ত্রণা আরো কিছু গুরুতর অনিষ্টসাধন করিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর। যে চিত্তবীর সে কোন অবস্থাতেই চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারায় না। দুষ্মন্তও ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারান নাই। বরং সেই পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার চিত্তধর্ম্ম বর্দ্ধিতগৌরবে প্রকাশ

পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবিজিত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যন্ত্রণাবিহ্বলাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করেন তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ—

বেত্রবতি মদ্বচনাদমাত্যমার্য্যপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দীয়তামিতি।

বেত্রবতি, আমার কথায় অমাত্য আর্য্য পিশুনকে গিয়া বল যে অনেক বেলায় জাগিয়াছি বলিয়া ধর্ম্মাসনে অধিরূঢ় হইতে আজ আমরা অসমর্থ। তিনি পৌরকার্য্য যাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।

যন্ত্রণায় দুষ্মন্তের রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই এবং সেই জন্য তিনি আজ বিচারাসনে বসিতে অক্ষম। কি গুরুতর কি লঘুতর সকল কার্য্যই তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি সে প্রণালী অনুসরণে অশক্ত। আজ তিনি নিজের আসনে প্রধানামাত্যকে বসাইয়া আপনি কেবল কাগজ পত্র দেখিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। প্রজাবৎসল রাজকার্য্যানুরক্ত দুষ্মন্ত আজ প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য করিতে বাধ্য। তবে দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান, চিত্তসংযমে অমিতবল, রাজধর্ম্মপ্রতিপালনে দৃঢ়ানুরাগী। তাই আজিকার পরীক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত নন—তাই আজ পুরুষপ্রধানই রহিয়াছেন। দুষ্মন্ত দুষ্মন্ত না হইলে আজ ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেখা গেল যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে তিনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিল,—স্বয়ং দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অমঙ্গল; দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার আত্মীয় স্বজনের অমঙ্গল;

ভারতসাম্রাজ্যের অমঙ্গল। কার্য্য দুইটী লোকের কিন্তু তাহার ফল কোটী কোটী লোকের দ্বারা অনুভূত। রোমিও এবং জুলিয়েটে প্রণয়ের ফলও সেই প্রকার হইয়াছিল। By the introduction of the Prince in his political power, Shakespeare gives a public interest to the private history of the lovers. A whole community is represented in a state of ardent excitement, by which the public good is endangered : the Prince intercedes between the two contending parties, and thus, what in other respects was a private concern, becomes a matter of public and political importance, affecting the whole constitution of society and the common good."* সেক্সপীয়রকে ঘটনাকৌশলের দ্বারা এই সত্য বুঝাইতে হইয়াছে; কালিদাসকে তাহা করিতে হয় নাই, কেননা তাঁহার নাটকের প্রণয়ী নিজেই রাজা। তবে তিনি এই মহাসত্য বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার নায়কের প্রণয়ের ইতিহাস এমন প্রণালীতে বলিয়াছেন যে সেই মহাসত্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে সত্য এই—ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

দেখিলাম যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে বিষময় ফল ফলিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই—বিষময় ফল কেন ফলিল? ইহার প্রথম উত্তর, দুর্ব্বাসার শাপ। দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া

---

* Dr. Ulrici র Shakespeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠা।

দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে শাপ হইতে এত অনিষ্ট উৎপন্ন হইল মহাকবি কেন সে শাপ দেওয়াইলেন। ইহার উত্তর এই যে, দুর্ব্বাসা শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা শুনেন নাই। তাপসাশ্রমে অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্ত্তব্য শকুন্তলা তাহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে তাপসাশ্রমে সর্ব্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অতিথির সেবা করিতে হইত। শকুন্তলা প্রভৃতি সেই অতিথিসেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিতেন। শকুন্তলা প্রভৃতির সম্মুখে দুষ্মন্ত উপস্থিত হইবামাত্র অনসূয়া বলিয়াছিলেন—

দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়অং ফলমিস্‌সং অগ্‌ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্‌সদি।

আপনার ন্যায় অতিথিলাভে তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে। ওলো শকুন্তলে, উটজে যাও এবং ফলযুক্ত অর্ঘ্য আনয়ন কর। এই পা ইবার জল।

আবার শকুন্তলা যখন রাগের ভান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন. তখন অনসূয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

সহি ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো ামণম্।

সখি, অকৃতসৎকার অতিথিকে ত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্ত্তব্যতা এবং উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুষ্মন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন,

অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, সে যদি সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্ন যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য শাপগ্রস্ত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন তাহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। অর্থাৎ অগ্রে সমাজ পরে আপনি—অগ্রে অপরের চিন্তা পরে আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিশুদ্ধ, অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্দারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয়, তবে তাহা অতি অপরিশুদ্ধ, অতি নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তবে তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এ কথার অর্থ এই যে প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িণীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটী প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন। তিনি পবিত্রমনে পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার মন পবিত্র হইলে কি হইবে? তিনি প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিয়া তাঁহার প্রণয়কে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা অসম্পূর্ণ

ছিল। সেই জন্য তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ। আর মহাকবি যদি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন তবে যিনি যেখানে প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিবেন তাঁহারই অদৃষ্টে এইরূপ দুঃখ ঘটিবে। ইহার একটী অর্থ এই যে, রমণীর ন্যায় যে হৃদয়প্রধান এবং হৃদয়ের মোহে বেশী মুগ্ধ তাহার হৃদয়কে শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে রাখিতে হয়, এবং সমাজসেবা এবং অপরের নিমিত্ত চিন্তা সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং উপকরণ। রমণীর যে অন্তর্লীনতার ভাব তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি তাহা আত্মসম্বন্ধে হইলে সমাজবিরোধী। সে ভাব অধিক প্রশ্রয় পাইলে সমাজের অনিষ্ট সাধন করে। সেই নিমিত্ত সে ভাবকে শিক্ষা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে শিক্ষা সহজে লাভ হয় না এবং হইবার নয়। শকুন্তলা জন্মাবধি পরোপকারব্রতে ব্রতী থাকিয়াও সে ভাব দমন করিতে অক্ষম। অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরও মত এই যে, দাম্পত্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের প্রেম আপনাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের অনিষ্টকারী হয় এবং সেই নিমিত্ত মানুষের সে অবস্থায় প্রবেশ করা অনুচিত। আমরা মানুষকে এ রকম ব্যবস্থা দি না, কেননা আমরা ইহাকে পাগলের ব্যবস্থা মনে করি। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করি যে এখনও মনুষ্যের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয় কিছু বেশী পরিমাণে মোহমুগ্ধকারী বলিয়া সমাজসম্বন্ধে কিছু অনিষ্টকর। এবং সেই জন্যই আমরা বলি যে দম্পতির প্রণয়কে শিক্ষা দ্বারা সমাজের অনুকূল করা কর্ত্তব্য। দুষ্মন্ত-নিমগ্না শাপগ্রস্তা শকুন্তলার অর্থও তাই। তাহাই অভি-

জ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।

শকুন্তলার মোহ দুর্ব্বাসার শাপের একটী কারণ বটে। কিন্তু সেই কারণের অন্তরালে আর একটী কারণ আছে। শকুন্তলা সমস্ত বাহ্য জগৎ ভুলিয়া দুষ্মন্তকে ভাবিতেছিলেন বলিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে দুষ্মন্ত তোমাকে ভুলিয়া যাইবেন। দুষ্মন্তও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে তাঁহাদের বিবাহের প্রমাণ দেখাইতে চাহিলেন। শুনিয়া দুষ্মন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—

উদারঃ কল্পঃ।
বেশ কথা।

তখন শকুন্তলা অঙ্গুরীয় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই। দুষ্মন্ত তাঁহাকে চতুরা কুলটা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গুরীয় সওয়ায় যদি বিবাহের অন্য প্রমাণ থাকিত তাহা হইলে ত কোন গোল হইত না। দুষ্মন্ত নিজেইত পরে মাধব্যকে বলিয়াছিলেন—মাধব্য তুমি কেন আমাকে তখন বিবাহের কথা মনে করিয়া দেও নাই, এবং প্রখরবুদ্ধি মাধব্য উত্তর করিয়াছিলেন যে আপনি শকুন্তলার বিষয় আমাকে যে রকম বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে তাহার সহিত আপনার বিবাহ হয় নাই। অন্য প্রমাণ থাকিলে দুর্ব্বাসাও শকুন্তলাকে সে রকম শাপ দিতে পারিতেন না এবং দিলেও তাহা কার্য্যকর হইত না। কিন্তু সে বিবাহের

অন্য প্রমাণ ছিল না, কেন না সে বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোপনে সম্পন্ন হইবার কারণ কি? না দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপু। দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপুই দুর্ব্বাসার শাপের এবং সেই শাপোদ্ভূত সমস্ত অনিষ্টের অবান্তর কারণ। কিন্তু সে রিপু অপবিত্র নয়। দুষ্মন্ত রিপুন্মত্ত বটে কিন্তু দুরাচার নন। তিনি শকুন্তলাকে কলঙ্কে ডুবাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলনপ্রার্থনা করেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে পত্নী করিয়াছিলেন—আসমুদ্র ভারতরাজ্যের রাজ্ঞী করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ হইয়া তিনি কণ্বের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে শকুন্তলাকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই আপনি এত কষ্ট পাইলেন, শকুন্তলাকে এত কষ্টে ফেলিলেন এবং সমস্ত ভারতরাজ্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলেন। ইহার অর্থ এই যে শুধু শুদ্ধান্তঃকরণে বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। মনুষ্যের হৃদয় সকল সময় এক কথা কয় না।

> অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।
>
> (অভিজ্ঞানশকুন্তল, পঞ্চমাঙ্ক)

যাহার হৃদয় অপরিজ্ঞাত তাহাতে প্রীতিবন্ধন এইরূপ বৈরিতায় পরিণত হইতে পারে।

আরো এক কথা। সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। মনুষ্যচরিত্রে যাহা কিছু ভাল, উৎকৃষ্ট এবং মহৎ

আছে তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ পায় এবং দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুষ্মন্ত-চরিত্রের বিশ্লেষণে আমরা এ কথার পরিস্কার প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আত্মেতর ভাবের কাছে আত্মভাবের লয়েই সে চরিত্রের গৌরব এবং উৎকর্ষ। আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে তাহা সমাজ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতালাভ করে না। সমাজ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহত্ত্বসংযুক্ত হয়। নচেৎ পশুপ্রবৃত্তির ন্যায় হেয় হইয়া থাকে। দাম্পত্যসম্বন্ধও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত না হইলে হীনতা এবং অপবিত্রতা দোষে দূষিত হয়, কেন না তাহা হইলে তাহা পশুপক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না। সমাজই উন্নতনীতির প্রকৃত উৎস এবং উদ্দীপক। এবং সেই জন্যই সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণি-গ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা অনিষ্ট ঘটাইলেন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল সমাজতত্ত্বের একখানি প্রধান কাব্য।

কিন্তু দুষ্মন্ত যে চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া মহাপাপে পতিত হইলেন, ইহা কি ভয়ানক কথা! মহাকবি যে প্রণালীতে এই মহাপাপের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমরা সমস্ত মনুষ্যজাতির নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত হই। দুষ্মন্ত সকল গুণের আধার। তিনি রাজা হইয়া, সমগ্রভারতের

রত্নভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও বিলাসবিদ্বেষী। তিনি মনে করিলে দিবারাত্রি বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন এবং বিচিত্র প্রণালীতে বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় দিবারাত্রি পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার আমোদপ্রমোদ গুলিও পুরুষত্বব্যঞ্জক। বিশাল ধনুর্ব্বাণহস্তে মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গান্তরে বিচরণ করিতেই তাঁহার আমোদ। রাজকার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর অভিনিবেশ, অপরিমেয় শ্রমশীলতা। বাহুবলে তিনি অদ্বিতীয়; শত্রুদমনে ক্ষিপ্রহস্ত, আগ্রহচিত্ত, অসীমসাহস। তিনি মানুষ, আত্মসেবায় অনুরক্ত। কিন্তু সমাজসেবার্থ আত্মবিসর্জ্জন আবশ্যক হইলে তিনি তাহা অবলীলাক্রমে করিতে পারেন। তিনি মানুষ, মানুষের ন্যায় মোহমুগ্ধ হন, কিন্তু আবশ্যক হইলেই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নিমেষমধ্যে মোহজাল কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিতে পারেন। তিনি গুরুজনসম্ভ্রমকারী কিন্তু স্বাধীনচিন্তাশীল। তিনি সৎপ্রবৃত্তির প্রশস্ত আধার—বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের প্রতিপালক, সকলেরই হিতৈষী। তিনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ। তিনি পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু তিনিও রিপুর শাসনে স্খলিতপদ। রিপু কি ভয়ানক বস্তু! রিপুর কি অসীম শক্তি! রিপুসেবা কি বিষম, কি দূষণীয় কার্য্য! এ কথা অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটেও এ তত্ত্ব দেখিতে পাই

না। রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্য জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল বলিয়া রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল থাকাতেও রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব রোমিও এবং জুলিয়েটের এমন অর্থ হইতে পারে যে বাহ্যজগৎ অনুকূল থাকিলে রিপুসেবা দূষণীয় নয়। কিন্তু উন্নতনৈতিক-নিয়মশাসিত আধ্যাত্মিক জগৎ অপরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয়ের সম্বন্ধে যাহা দূষণীয় তাহা সকল সময়েই দূষণীয়। বাহ্যশক্তি প্রবলতম হইলেও দুর্ব্বল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই প্রবল। মানবপ্রধান মনু বলিয়াছেন—

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

এবং বাল্মীকি বলিয়াছেন ঃ—

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়াঃ।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ।

অতএব বাহ্যশক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবল বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবলতম অপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্তই রোমিও এবং জুলিয়েটের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা শুদ্ধ সেই নায়ক নায়িকার জন্য দুঃখিত হই। কিন্তু দুষ্মন্তের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত ভাবিত হই। যখন দেখি যে রোমিওতে প্রণয় এবং রিপূন্মত্ততা বই আর কিছুই নাই তখন মনে হয় যে

আর কোন মানসিক শক্তি থাকিলে রোমিওর ন্যায় রিপূন্মত্ত হইয়া সংসারের দুঃখভাগী হইতে হয় না। কিন্তু যখন দেখি যে দুষ্মন্ত সমস্ত মানসিক শক্তির আধার হইয়াও রিপূন্মত্ততা-বশতঃ বিষম পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত, তখন শুধু দুষ্মন্ত কেন সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই। এদিকে মানবজাতির ইতিহাস এবং অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ত সেই চিন্তার উদয় হয়। মনুষ্যমাত্রেই আজিও রিপুপ্রধান, রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল মহাপুরুষ জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নতনীতি, উন্নত চিত্তসংযম-শক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শস্বরূপ তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব। একটি মাত্র নাম করিলেই পাঠক এ কথার অর্থ বুঝিবেন। সে নাম আকব্বর সা। আকব্বর সা অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার 'নওরোজের' কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎ ও বলেন যে মানুষের বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে, তাহার রতিপ্রবৃত্তি অন্যান্য সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা বলবতী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানবজাতির এই মানসিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটে পাওয়া যায় না, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যায়। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃশ্যকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্তই বুঝিয়া দেখা হইল। কিন্তু এখনও কিছু দেখিতে বাকি আছে। মহাকবি দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা

বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতিকৃতি। পুরুষের অর্থ—জগতের সূক্ষ্ম, অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্থূল, অপলাপ্য, পরিবর্ত্তনশীল উপাদান। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দুষ্মন্ত-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটি মর্ম্ম এই যে, দুষ্মন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাঁহার মনের এমন একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি যখনি কোন মোহে অভিভূত হইতেছেন, তখনি তিনি সেই মোহ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষভাব ধারণ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনপলাপ্য। কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সে রকম কোন ভাব দেখিতে পাই না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন; কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিভূত, তখন তাঁহাকে দুষ্মন্তের ন্যায় অন্য কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবের দিকে ধাবমান দেখিতে পাই না। যেন তাঁহাতে কোন অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান নাই। অধিকন্তু, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শকুন্তলা-চরিত্রের ব্যাখ্যা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শকুন্তলার মন concrete সম্বন্ধ, দুষ্মন্তের মন abstract প্রিয়; শকুন্তলার হৃদয় জড়-জগৎসাপেক্ষ, দুষ্মন্তের হৃদয় তাহার বিপরীত। এই এক কথা। আবার দেখি যে, পবিত্র তাপসাশ্রমে রিপুসেবারূপ জড়জগতের কার্য্য হইতেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মাত্মক ঋষি-কুলপতি কণ্ব শকুন্তলাকে সংসারাশ্রমে প্রেরণ করিতেছেন;

এবং দেবতুল্য কশ্যপ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে দম্পতিরূপে পুনর্ম্মিলিত দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্ত্তি। আবার কুমারসম্ভব পড়িয়া আমরা জানি যে কালিদাস সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ছিলেন, এবং কুমারসম্ভবে সাঙ্খ্যদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করিয়াছেন। এবং সেই কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন ঃ—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং ভস্মাবশেষঃ কথমেব মুষ্ণঃ॥

বোধ হয় আজিও হরকোপানল সমুদ্রে বাড়বানলের ন্যায় নিশ্চয়ই তোমাতে জ্বলিতেছে। নচেৎ, হে মন্মথ, তুমি ভস্মাবশিষ্ট হইলেও বিরহীদিগের পক্ষে কেন এরূপ উষ্ণ হও।

এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবের এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিক ভাবে মিলন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিক ভাবে মিলন। এই প্রভেদ বশতঃ কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মদন জয়ী হইল। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিতপস্বীর ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে

পুরুষের দ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাশ্রমে প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্তের পদস্খলন দেখাইলেন, এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীদিগকে দুষ্মন্তের ইতিহাসের মধ্যে আনয়ন করিয়া পাঠককে বুঝাইলেন যে, জগতে প্রকৃতির বলে স্ত্রীপুরুষের যোগসাধন হয় বলিয়া দুষ্মন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত নন, আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত। এবং জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যমাত্রই দুষ্মন্তের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চম অর্থ।

কিন্তু প্রকৃতির বলে স্ত্রীপুরুষের মিলন যদি সৃষ্টির নিয়ম হইল, তবে সে নিয়মসম্ভবনীয় বিষময় ফল নিবারণের উপায় কি? মহাকবি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপেরদ্বারা দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া এবং সেই পরীক্ষায় দুষ্মন্তকে জয়ী করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন যে মনুষ্যমনের শক্তি অসীম এবং অপরিমেয়, প্রকৃতি যতই বলবতী হউক, মনুষ্যের মন তদপেক্ষা বলবান্। মানুষ চেষ্টা করিলে উক্ত নিয়মসম্ভবনীয় বিষময় ফল নিবারণ করিতে সক্ষম। কিন্তু সে চেষ্টা অল্পায়াসে সুসিদ্ধ হইবার নয়। প্রকৃতি বড় ভয়ানক শক্তি। সে শক্তি দমন করিতে হইলে মানুষকে দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বিপরীত যুদ্ধ করিতে হইবে। করিলে তবে সংসারাশ্রম সুখ, শান্তি এবং পুণ্যের আশ্রম হইবে। সংসারাশ্রম একটি ভয়ানক রণস্থল। সে রণস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকে বীরপ্রধান হইতে হইবে, নচেৎ

পাপ-রুধিরে এবং যন্ত্রণার হাহাকাররবে* রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আরো একটি কথা আছে। দুষ্মন্তের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে যে মানসিকশক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দুইটী পৃথক্ এবং স্বাধীন পদার্থ, মানসিকশক্তি প্রবল হইলেই যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমিত হইবে এমন স্থিরনিশ্চয়তা নাই। অতএব ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তির উপর নির্ভর করিলে সকল সময়ে অভিলষিত ফললাভ নাও হইতে পারে। সেইজন্য মানসিকশক্তির সহিত সমাজ-শক্তি যোগ করা আবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে সেই প্রণালী এবং নিয়মের গুণে লোকের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আইসে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস এই মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয়; এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীগণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে বহুবিবাহ বিষম অনিষ্টকারী। তিনি দেখাইয়াছেন যে উভয়প্রকার বিবাহই প্রকৃতি বা ঐন্দ্রিয়িক শক্তির ফল এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তির প্রতিপোষক। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহাশক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল মানসিকশক্তি এবং সমাজ-শক্তির মহাকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অর্থ।

---

* বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষেও সেই রব শুনা যায় না?

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য। বেদান্তদর্শনে বলে যে, পুরুষই সত্য এবং সৎ, প্রকৃতি অথবা জড়জগৎ মিথ্যা এবং অ-সৎ—পুরুষই পদার্থ, প্রকৃতি ছায়ামাত্র। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখাইয়াছেন যে, পুরুষও যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমনি সত্য; পুরুষও যেমন সৎ, প্রকৃতিও তেমনি সৎ, পুরুষও যেমন পদার্থ, প্রকৃতিও তেমনি পদার্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রকৃতি যে রকম উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যে রকম প্রভাবশালী দৃষ্ট হয়, যে রকম স্বাধীন-কায়াবিশিষ্ট দেখা যায় তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে মহাকবির মতে, অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে, প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ পদার্থ—ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। প্রকৃতি যে ছায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন, একটি মহাপ্রভাবশালী, একটী বিষম সত্য অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে। সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা। এত অর্থ আর কোন্ কাব্যে কবে কে দেখিয়াছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয় অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনীয় বিষয়; জুলিয়েটের সহিত রোমিওর প্রণয় রোমিও এবং জুলিয়েটের বর্ণনীয় বিষয়। দুই খানি নাটকের বর্ণনার বিষয় এক, কিন্তু বর্ণনার প্রণালী বিভিন্ন। দুষ্মন্তের প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক নাই; রোমিওর প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক আছে। শকুন্তলার আত্মীয় স্বজন সকলেরই ইচ্ছা যে দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; রোমিওর আত্মীয় স্বজন কাহারো ইচ্ছা নয় যে জুলিয়েটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই প্রভেদ বশতঃ রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্যজগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল; অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল—রোমিও এবং জুলিয়েটে ঘটনার বাহুল্য; অভিজ্ঞানশকুন্তলে ঘটনার স্বল্পতা। যেখানে দ্বন্দ্ব মনে মনে সেখানে বাহ্যজগতের আবশ্যকতা কম; যেখানে দ্বন্দ্ব বাহিরে সেখানে বাহ্যজগৎ কাজে কাজেই প্রবল। অধিকন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী, সে নাটকের ব্যক্তিগণ্ একশ্রেণীভুক্ত না হইয়া, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কিন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নয় সে নাটকের ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নহে এবং

সেই জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তি এক শ্রেণীভুক্ত, দুই একজন ছাড়া সকলেই দুষ্মন্তের স্বপক্ষ। তাহাদিগের মধ্যে মহর্ষি কণ্ব সর্ব্বাংশেই প্রধান।

মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞানশকুন্তলের আখ্যায়িকার ভিত্তিস্থানীয়। তিনি শকুন্তলার পালক-পিতা। শকুন্তলার ঐহিক অদৃষ্ট তাঁহারই ইচ্ছানুগামী। তিনি ইচ্ছা করিলে শকুন্তলাকে যাবজ্জীবন তপশ্চর্য্যায় রাখিতে পারিতেন; তাঁহার ইচ্ছা না হইলে শকুন্তলা কখনই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। দুষ্মন্ত অগ্রে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পরে শকুন্তলাকে লাভ করিতে যত্নশীল হন। শকুন্তলাও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতেন বলিয়া দুষ্মন্তের প্রণয়লাভ করিতে অভিলাষিণী হন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা—এই দুই ব্যক্তির মূলে মহা-ঋষি কণ্ব। মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড।

কি চমৎকার মেরুদণ্ড! মহর্ষি কণ্বকে বুঝিয়া উঠা যায় না। কল্পনা তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। চিন্তা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়ায়। তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য; তিনি ইহকাল এবং পরকাল; তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি; তিনি মোহ এবং বৈরাগ্য; তিনি চিন্তা এবং হৃদয়; তিনি শান্তি এবং তেজ। মহর্ষি কণ্ব ভারতের একজন প্রখ্যাতনামা ঋষি। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, পার্থিব সুখ তুচ্ছ করিয়া, দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা বিনষ্ট করিয়া, জগতের মোহমুগ্ধকারী মায়াজাল কাটিয়া ফেলিয়া, দেহ, মন, আত্মা, সকলই ব্রহ্মসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর মর্য্যাদা,

পৃথিবীর গৌরব, ইহার কিছুই তাঁহার প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হয় না। এ সকলই তাঁহার কাছে সামান্য, মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর। যে পার্থিবতায় সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ সে পার্থিবতা তাঁহার কাছে হতশক্তি, হতপ্রভাব, মহিমাশূন্য। পৃথিবীর মোহিনী শক্তি তাঁহার কাছে বিলুপ্ত। পার্থিব পদার্থের সহিত তাঁহার চিন্তা, তাঁহার হৃদয়, তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা, তাঁহার কিছুরই সংস্রব নাই। পার্থিব পদার্থ তাঁহার চক্ষে নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্রমনেরই যোগ্য। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে। তিনি মর্ত্ত্যলোকে আছেন কিন্তু ব্রহ্মলোক তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান। পার্থিব পদার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু তিনি পার্থিব পদার্থের নিকট নাই, পার্থিব পদার্থের শাসন অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি যেন মনুষ্যাপেক্ষা অনেক উচ্চতর মহাপুরুষের ন্যায় পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ করেন। তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান আরাধনা—ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য, একমাত্র সুখ, একমাত্র অভিলাষ। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্মবিষয়ক, তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মআরাধনায়, তাঁহার আশা ব্রহ্মপদে—তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে রহিয়াছেন। ব্রহ্মবলে তিনি বলীয়ান্। তিনি দুষ্মন্তের ন্যায় বীরপুরুষ নন; ক্ষত্রিয়যোদ্ধার ন্যয় তাঁহার বাহুবল নাই; তিনি শস্ত্রবিদ্যার অধিকারী নন। তথাপি তিনি শত্রুদমনে সক্ষম। তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতপ্রদেশ রাক্ষসনামধেয় অনার্য্যজাতির বাসস্থান। রাক্ষসেরা দলবদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে আশ্রমবাসীদিগের যজ্ঞকার্য্যের এবং তপশ্চর্য্যার বিঘ্নোৎপাদন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, যখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে থাকেন তখন তাহারা আশ্রমবাসীদিগের বৈরিতাচরণে সাহসী হয় না। দুষ্মন্তের আশ্রমপ্রদেশে অবস্থানকালে রাক্ষসেরা আশ্রম আক্রমণ করে। ঋষিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া দুষ্মন্তের বাহুবলের প্রার্থনায় তাঁহাকে জানাইলেন যে—

> কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি নঃ
> ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। (২য় অঙ্ক।)

মহর্ষি কণ্ব উপস্থিত না থাকা হেতু রাক্ষসেরা যাগযজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে।

কণ্বের কি প্রতাপ! তিনি উপস্থিত থাকিলে দুরন্ত বলবিক্রমশালী রাক্ষসেরাও তাঁহার আশ্রমের নিকট আসিতে সাহস করে না। তাঁহার বাহুবল নাই। কিন্তু তাঁহার এমন কোন আধ্যাত্মিক বল আছে যাহার কাছে বাহুবলপ্রধান দুরাচার মন্ত্রাহতের ন্যায় হৃতসাহস এবং নির্বীর্য্য। কথাটি কাল্পনিক নয়। আধ্যাত্মিক তেজের দ্বারা দৈহিকশক্তির অপনয়ন আমরা সকলেই স্বল্পপরিমাণে দেখিয়া থাকি। মহর্ষি কণ্ব আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার কাছে অসংখ্য দৈহিকবলপ্রধান রাক্ষস যে মন্ত্রাহত বিষধরের ন্যায় নির্জীব হইয়া থাকিবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মহাপুরুষের কাছে সহস্র সহস্র দুর্দ্দমনীয় দুরাচার বলবীর্য্যহীন ভীরুর ন্যায় ভগ্নোদ্যম এবং ভয়াকুল, সে মহাপুরুষের মহিমার কে ইয়ত্তা করিবে। তাঁহার অসীম এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির কে পরিমাণ করিবে। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিস্তার এবং গভীরতা কে বুঝিয়া উঠিবে। তিনি রক্ত-

মাংস নন, তিনি আত্মা; তিনি মানুষ নন, তিনি মন্ত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বলে তাঁহার যেমন বাহ্যপ্রভাব, তেমনি বাহ্যজ্ঞান। অনতিবিলম্বে শকুন্তলার ভাগ্যে বিষম কষ্টভোগ আছে তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় হইয়া গেল। কিন্তু কাহারও কাছে পরিণয়সম্বাদ না পাইয়া ও আশ্রমে আসিয়াই—

সঅং তাদকস্সবেণ এব্বং অহিণন্দিঅং দিট্টিআ ধুমাউলিঅদিট্ঠিণো বি জঅমাণস্স পাঅএ এব্ব আহুদী পড়িদা। বচ্ছে সুসিস্সপরিদিন্না বিঅ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিপড়িরক্খিদং তুমংভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি।

কণ্ব এ কথা কেমন করিয়া জানিলেন? প্রিয়ম্বদা বলেন যে তিনি এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন—

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥

হে ব্রহ্মন্ তোমার কন্যাকে অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় পৃথিবীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত দুষ্মন্তনিহিত তেজ ধারণ করিতেছেন জানিও।

আকাশবাণীর অর্থ কি? ইহা কি যথার্থই দেবলোকে উচ্চারিতবাক্য না ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনার আধ্যাত্মিকজ্ঞান? এ প্রশ্নের মীমাংসা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আকাশবাণীর অর্থ যাহাই হউক, এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকতা প্রবল তাঁহারই আকাশবাণীতে অধিকার—যাঁহার আধ্যাত্মিকতা কম তিনি দেশকাল অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনার জ্ঞানলাভ

করিতে পারেন না। বাহ্যজগৎ মহা-ঋষির আত্মার অধীন—আত্মার আজ্ঞাকারী—আত্মার ক্রীড়ার পদার্থ। যখন স্বামী-ভবনগমনার্থ শকুন্তলা বেশবিন্যাস করিতেছেন, তখন দুইজন ঋষিকুমার তাঁহার নিমিত্ত মহামূল্য অলঙ্কার আনয়ন করিল। গৌতমী চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বচ্ছ ণারঅ কুদো এদং।

বাছা, নারদ, এ সব কোথায় পাইলে ?

নারদ উত্তর করিলেন—

তাতকাশ্যপপ্রভাবাৎ।

গুরুপ্রধান কাশ্যপের প্রভাবে।

তখন গৌতমী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং মানসী সিদ্ধি

তিনি কি তাঁহার মানসিকশক্তিদ্বারা এ সকল সৃজন করিয়াছেন ?

কণ্ব মানসিকশক্তিদ্বারা সে সকল সৃজন করেন নাই বটে; কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে এ রকম প্রশ্ন হইতে পারে তাঁহার মানসিকশক্তি যে এক রকম অসীম তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাহ্যজগৎ তাঁহার অপরিসীম অনন্তগভীর আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভূত। তিনি বাহ্যজগতে না থাকিয়াও বাহ্যজগতের অধিকারী। তিনি যেন অনন্তাকাশে উঠিয়া ক্ষুদ্র পৃথিবীকে তাঁহার নখদর্পণস্থ করিয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের আত্মায় লীন হইয়া রহিয়াছেন। বাহ্যজগৎ তাঁহার নখদর্পণস্থ বলিয়াই তাঁহার বাহ্যপ্রভাব এত অনুভূত। পৃথিবী কেমন করিয়া তাঁহার ইয়ত্তা করিবে ?

কণ্ব ধীর এবং গম্ভীরস্বভাব। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা এবং চিন্তাশীলতার ফল। অন্তর্দর্শী আত্মাপ্রধান ব্যক্তিমাত্রেই

গম্ভীর হইয়া থাকে। চিন্তাশীল ব্যক্তি ধীর। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্ক পাঠ করিতে করিতে কণ্বের ধীর এবং গম্ভীর স্বভাব দেখিয়া মোহিত হইতে হয়—মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বোধ হয় যেন কোন পূজ্যতম মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি—হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না, মনে হয় যেন তাঁহার কাছে আসিয়া উন্নতি এবং পবিত্রতা লাভ করিয়াছি, অথচ তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হয় না, নিকটে যাইবার অযোগ্য বলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। শকুন্তলা আশ্রম হইতে যাত্রা করিতেছেন। এক সরোবরের ধারে আসিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিলেন যে, তাঁহার আর শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে আসা কর্ত্তব্য নয়। তখন কণ্ব একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া মনে করিলেন যে, দুষ্মন্তকে পাঠাইবার উপযুক্ত সম্বাদ একটি স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। এই মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বেদ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল যিনি মন্থন করিয়াছেন এবং উন্নতজ্ঞান যাঁহার প্রাণবায়ু তিনি আবার চিন্তা করিতেছেন যে কি রকম কথা বলিয়া পাঠাইব! ধীর এবং গভীর চিন্তাশীলব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রকম করে না। চিন্তা করিয়া মহা-ঋষি দুষ্মন্তকে এই কথা বলিতে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতকে উপদেশ দিলেন—

> আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উত্তমবংশকে চিন্তা করিয়া, আর সুহৃৎস্বজনেরা যাহা কোন রূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইহাঁকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে, বধূবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

যেমন মহাপুরুষ, কথাও তেমনি মহত্ত্বপূর্ণ। শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু—‘কণ্বস্য কুলপতেঃরুচ্ছ্বসিতম্।’ কিন্তু কণ্ব শকুন্তলার নিমিত্ত কি রকম সুখের কামনা করিলেন? তিনি এমন কামনা করিলেন না যে দুষ্মন্ত তাঁহাকে মহিষীশ্রেষ্ঠ করেন এবং অন্যান্য ভার্য্যা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এত স্নেহের বস্তুর নিমিত্ত সেই কামনাই স্বাভাবিক এবং আর কেহ হইলে সেই কামনাই করিত। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না সে কামনা অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতমূলক। শকুন্তলা তাঁহার আদরের বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মত মহাপুরুষ শকুন্তলার সুখের অভিলাষী হইয়া অপরের ক্ষতি এবং অনিষ্টকামনা করিতে পারেন না। ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বার্থপরবশ হইয়া মোহান্ধ হন না; ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের মোহজাল অদৃশ্য হইয়া যায়। তাঁহাদের চিন্তা সকল সময়েই ন্যায়মূলক। ন্যায়ানুবর্ত্তিতা উচ্চ পরিশুদ্ধ চিন্তার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষণ। সে লক্ষণ মহর্ষি কণ্বের চিন্তায় বিশেষরূপে জাজ্বল্যমান। তাঁহার চিন্তার উচ্চতা, উদারতা এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে মানবগুরু বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কণ্বের চিন্তার আর একটি রমণীয় উপকরণ আছে—সেটি তাঁহার শকুন্তলার প্রতি উপদেশে প্রকাশ। সে উপদেশ এই—

তুমি এস্থান হইতে ভর্ত্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল

হইও, এবং সৌভাগ্য কালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ পায় আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে।

ইহাতে এই কয়টি গুণের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সম্ভ্রম, ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে প্রেম, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং নম্রতা। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই গুণগুলি থাকিলে সংসাররূপ রঙ্গভূমির সকল স্থানেই মানুষ মানুষের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গুণগুলি থাকিলে শুধু কুলবধূ কেন, সকল লোকেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। কণ্ব একটি কুলবধূকে যে উপদেশ দিয়াছেন সে উপদেশ সমস্ত মানব জাতির সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র। লেয়াটীসকে প্রদত্ত পোলোনিয়সের উপদেশের এত সারবত্তা এবং উপযোগিতা নাই। সে উপদেশ সকলের অনুসরণীয় নয়। কিন্তু কণ্বের উপদেশের এত উৎকর্ষ কিসে হইল ? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার উৎকর্ষের প্রধান কারণ হৃদয় অথবা হৃদয়ের কাছে স্বার্থপরতার অপলাপ। গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম—ইহার অর্থ, আত্ম-গরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ না করা—ইহার অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়ব্যক্তির অনুরোধে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা। পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হওয়া—ইহার অর্থ, দরিদ্র উপকারকের উপকার করা—সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত না হওয়া—ইহার অর্থ, অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করা। আর সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার

করা—ইহার অর্থ যে কি চমৎকার তাহা কি বলিব। ইহার অর্থ, *Love thine enemies*—যে কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া কোটী কোটী সুসভ্য এবং উন্নতমতি মনুষ্য এখনও যিশু-খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন! এর কাছে কি পোলোনিয়সের উপদেশ দাঁড়ায়? সে উপদেশে হৃদয় কোথায়? সে উপদেশে জগতের আত্মা কোথায়? আবার এই উপদেশ দিয়া মহা-ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

> কথং বা গৌতমী মন্যতে।

এই কথায় গৌতমীই বা কি বলেন?

রমণীর কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মহর্ষি বৃদ্ধা এবং প্রবীণা গৌতমীর মতসাপেক্ষ—গৌতমীকে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর উপদেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ইহাও তাঁহার নম্রতার এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতার সুন্দর পরিচয় দিতেছে। উচ্চতা, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, নম্রতা, গভীর-সহৃদয়তা, ধীরতা এবং সতর্কতা কণ্বের চিন্তার প্রধান লক্ষণ এবং উপকরণ।

ফলতঃ কণ্বের হৃদয় একটি আশ্চর্য্য পদার্থ। সকল বস্তু, সকল জীব, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভক্তি স্নেহ এবং আদরের জিনিস। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার কালে তিনি আশ্রমের তরুলতা প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
> আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

তরুলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ এবং শুশ্রূষার উল্লেখ করিয়া মহর্ষি কণ্ব আপনার হৃদয়ের কি চমৎকারিত্বই দেখাইলেন! সে হৃদয় যথার্থই শকুন্তলার হৃদয়ের ন্যায় তরুলতাকে ভালবাসে এবং তরুলতার নিমিত্ত ভাবে। এবং সেই জন্যই মহর্ষি কণ্ব আজ তরুলতার কাছে শকুন্তলাকে বিদায় দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনিই ত শকুন্তলাকে তরুলতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যেমন তরুলতার প্রতি তেমনি পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার স্নেহ এবং মমতা। তিনি আশ্রমের সমস্ত মৃগ মৃগী এবং মৃগশাবকের ইতিহাস জানেন। যখন শকুন্তলার পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার পুত্রসম মৃগটি তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল তখন তিনিই ত শকুন্তলাকে বলিলেন যে ঃ—

> বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোষক ইঙ্গুদী তৈলসেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

এত খবর যে রাখে এবং এমন করিয়া যে পশুপক্ষীর কথা বলে, পশুপক্ষী যথার্থই তাহার হৃদয়ের বস্তু—সে যথার্থই পশুপক্ষীর পিতামাতার স্থানীয়। শকুন্তলাও তাই বলেন। তিনি সেই অনুসরণকারী মৃগটিকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন ঃ—

> এখন আমি আবার চলিলাম; এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন।

মহর্ষি কণ্ব সমস্ত জগৎকে ভালবাসেন, সমস্ত জগৎকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার হৃদয় স্নেহের উৎস। শকুন্তলাকে বিদায়

দিবার সময় সে হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলা যখন তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে সম্বোধন করিলেন তখন তিনি বলহীনা রমণীর ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন ঃ—

> বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহাহইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে।

অটল, অনন্তপ্রসারিত, অভ্রভেদী, তুষারমণ্ডিত হিমাচল রবিকিরণস্পর্শে দরদর ধারায় গলিয়া যাইতেছে!

কণ্ব সংসারত্যাগী, বিষয়বাসনাশূন্য, পার্থিবতাপরিমুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মসর্ব্বস্ব, ঊর্দ্ধদর্শী। কিন্তু পৃথিবীতে না থাকিয়াও তিনি পৃথিবীময়। তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহার পরমস্নেহ ও শ্রদ্ধার বস্তু। তিনি পৃথিবীর কিছুই চাহেন না, কিন্তু পৃথিবীর কীটাণুকীটও তাঁহার কাছে আদৃত এবং সম্মানিত। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও তাঁহার স্বর্গের অন্তর্ভূত। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্মসম্বন্ধ, কিন্তু জগতের সকলই তাঁহার ব্রহ্মের অন্তর্গত। তিনি চিন্তা, কিন্তু তাঁহারই নাম হৃদয়। তিনি মোহবিজয়ী তপস্বী, কিন্তু তাঁহারই নাম মায়া। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! আশ্চর্য্য বৈরাগী!

কণ্ব যেমন ধীর এবং শান্তপ্রকৃতি তেমনি তেজস্বী। তাঁহার তেজের প্রমাণ—শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত, কেন না শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত তাঁহারই শিষ্য এবং প্রতিনিধি। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতকে আমরা কণ্বের অংশ বলিয়া বিবেচনা করি, কণ্ব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বিবেচনা করি না। এবং সেই কারণে

আমরা শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের দ্বারা কণ্বকে বুঝাইতেছি। শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া দুষ্মন্ত যখন তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করিলেন, তখন শার্ঙ্গরব অকুতোভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

গান্ধর্ব্ববিবাহরূপ অনুষ্ঠিতকার্য্যের অপলাপ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ বিমুখতাচরণ করা কি রাজার উচিত?

আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাট্‌কে এ রকম কথা যে বলে সে পৃথিবীর কাহাকেও ভয় করে না, সে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্‌, তাহার তেজ এবং মধ্যাহ্নরবির তেজ একই বস্তু। দুষ্মন্ত যখন আবার তাঁহাদের কথার প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ—

মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্যমত্তেষু।

ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তিদিগেরই এইপ্রকার চিত্তবিকার হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গরব ঋষিকুমার। তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না, পার্থিববল, পার্থিবশক্তি, পার্থিবসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয়। তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা। তিনি রক্তমাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ। তিনি শান্তি নন, তিনি প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে, তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন ঃ—

বিনিপাতঃ।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীমমহিমামণ্ডিত পুরুসভায়

দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বিনিপাতঃ।' মহর্ষি কণ্ব হিমাচলের ন্যায় দরদরধারায় গলিতেও পারেন এবং বিসূবিয়সের ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিতেও পারেন! কল্পনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে!

যদিও মহর্ষি কণ্বের সম্পর্কে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত একই ব্যক্তি, কিন্তু কণ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে অতি চমৎকার প্রভেদ লক্ষিত হয়—দুই জনকে প্রকৃষ্টরূপে দুই ভিন্নব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাঁহাদের কথা অতি অল্পই আছে এবং তাঁহাদিগকে একটির অধিক কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে স্বল্পপরিমিত স্থান মহাকবি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের পূর্ণ, পরিষ্কার এবং হৃদ্বোধক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা দুইজনে একই গুরুর শিষ্য; তাঁহাদের দুই জনের জীবনপ্রণালী একই রকম; তাঁহাদের দুই জনের শিক্ষা একই প্রকার; তাঁহাদের দুই জনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সকলই এক। কিন্তু তাঁহারা দুই জনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির লোক। শার্ঙ্গরব কিছু বাহ্যদর্শী; শারদ্বত অন্তর্দর্শী। নির্জ্জন, নিঃশব্দ, শান্তিময় আশ্রম হইতে আসিয়া হস্তিনাপুরের জনাকীর্ণ রাজবাটী দেখিয়া তাপসদ্বয় এক নূতন ভাব অনুভব করিলেন। কিন্তু সে ভাব শার্ঙ্গরবে একরকম, শারদ্বতে ভিন্নরকম। শার্ঙ্গরব শারদ্বতকে বলিলেন ঃ—

তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥

আমরা নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনেই থাকি। এই জনাকীর্ণ গৃহ অগ্নিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে বলিলেন ঃ—

অভ্যাক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি॥

স্নাতব্যক্তি যেমন অস্নাতকে, শুচি যেমন অশুচিকে, জাগরিত যেমন নিদ্রিতকে এবং বিমুক্ত যেমন বদ্ধকে দেখে আমি এখানে সেইরূপ বিষয়সুখাসক্ত লোককে বুঝিতেছি।

দুইজনে একই দৃশ্য দেখিলেন, কিন্তু সে দৃশ্য একজনের মনকে এক রকমে বিচলিত করিল, আর একজনের মনকে আর এক রকমে বিচলিত করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া শার্ঙ্গরবের এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড মনে হইল; শারদ্বতের শুচির তুলনায় অশুচি, পবিত্রতার তুলনায় অপবিত্রতা, জাগরণের তুলনায় নিদ্রা এবং মুক্তভাবের তুলনায় দাসত্বশৃঙ্খল মনে হইল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবের মনে বাহ্যজগৎ প্রবল করিল, শারদ্বতের মনে অন্তর্জ্জগৎ প্রবল করিল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবে বাহ্যজগৎমূলক কল্পনাকে মাতাইয়া তুলিল; শারদ্বতে অন্তর্জ্জগৎনিহিত চিন্তাশক্তি প্রবল করিল। শার্ঙ্গরব সে দৃশ্য জড়জগতের সাহায্যে বুঝিলেন; শারদ্বত সে দৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্যে বুঝিলেন। শার্ঙ্গরব বাহ্যজগতের কবি; শারদ্বত অন্তর্জ্জগতের কবি। শার্ঙ্গরব বাহ্যস্ফূর্ত্তি; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। যখন রাজপুরোহিত তাঁহাদিগকে দুষ্মন্তের সম্মুখে লইয়া গেলেন

তখন শার্ঙ্গরবই দুষ্মন্তের গুণ বর্ণনা করিয়া পুরোহিতের সহিত কথা কহিলেন। যখন অভিবাদনাদি সমাপ্ত করিয়া কণ্বপ্রেরিত সম্বাদ জানাইতে হইল, তখন শার্ঙ্গরবই তাহা জানাইলেন। যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত পরিণয় অস্বীকার করিলেন, তখন শার্ঙ্গরবই ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত বিষধরের ন্যায় তাঁহার উপর বাক্যবিষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গরব যখন উন্মত্তের ন্যায় রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্তকে নকৃড়া ছকৃড়া করিতেছেন, তখন শারদ্বতের মনের অবস্থা কিরূপ ? তাঁহার এই কথাতেই সে অবস্থার প্রকাশ ঃ—

শার্ঙ্গরব বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ।
সোঽয়মত্রভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্॥

শার্ঙ্গরব, তুমি এখন থাম। শকুন্তলে, আমাদের যা বলিবার তা বলিলাম। এই মহামান্য রাজা এইরূপ কহিতেছেন। এখন যাহাতে ইহাঁর মনে প্রত্যয় হয় এমন কথা তুমি কিছু বল।

শারদ্বত এ সময়েও স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত। তিনি যেন কোন পক্ষেই নাই। তিনি যেন উভয়পক্ষের মধ্যবর্ত্তী বিচারক! শকুন্তলার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল। তাঁহার কথা শুনিয়াও দুষ্মন্তের প্রত্যয় হইল না। তিনি শকুন্তলাকে চতুরা দুশ্চারিণী বলিয়া গালি দিলেন। শার্ঙ্গরব আবার রাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শারদ্বত নিস্তব্ধ—তিনি একটিও কথা কহিলেন না। অবশেষে যখন শার্ঙ্গরব পুরুসভায় দাঁড়াইয়া জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের ন্যায় পুরুবংশের 'বিনিপাত' হইবে বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, তখন শারদ্বত এইমাত্র বলিলেন ঃ—

শার্ঙ্গরব কিমুত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ। প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্। (রাজানং প্রতি।)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী ॥
গৌতমি গচ্ছাগ্রতঃ।

শার্ঙ্গরব, কথা কাটাকাটির আর দরকার কি ? গুরুদেবের আদেশ অনুষ্ঠান করিলাম। চল আমরা ফিরিয়া যাই। (রাজার প্রতি)

এই তোমার স্ত্রী, ইহাকে এক্ষনে ত্যাগই কর বা গ্রহণই কর। স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছেই ত।

গৌতমি, চল, আগে আগে চল।

শারদ্বত আগেও যেমন, এখনও তেমনি—স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত। তিনি দেখিলেন যে, দুষ্মন্ত বুঝিলেন না এবং তিনি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি তর্ক করিবার লোক নন। তিনি কলহ করিবার লোক নন। তিনি শার্ঙ্গরবের ন্যায় তর্কও করিলেন না, কলহও করিলেন না। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়। অল্প কথায়, সরল ভাষায়, তিনি সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। যেন উচ্চতম রাজসিংহাসনাপেক্ষা উচ্চতর বিচারাসন হইতে অপরাধীর অপরাধ ব্যক্ত করিয়া বিচারপতি উঠিয়া গেলেন! শার্ঙ্গরব মনে করিলে পেরিক্লিস হইতে পারেন, দিমস্থেনিস্ হইতে পারেন, সিসিরো হইতে পারেন, বর্ক হইতে পারেন, মায়রাবো হইতে পারেন—ব্রিটিষ পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় মহাসভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে পারেন। শারদ্বত বিচারপতি ; কিন্তু তাঁহার যোগ্য বিচারাসন পৃথিবীতে নাই। তাঁহার স্থান আধ্যাত্মিক জগতে।

কিন্তু শার্ঙ্গরবই বল আর শারদ্বতই বল, মহর্ষি কণ্ব সকলেরই শ্রেষ্ঠ, সকলেরই গুরু, সকলেরই অধিনায়ক। মহর্ষি কণ্বের কে ইয়ত্তা করিবে!

কিন্তু কণ্ব যেমন সেই সকল ঋষি এবং ঋষিকুমারদিগের অধিনায়ক, গৌতমী তেমনি তাহাদের অধিনায়িকা। গৌতমীকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না। এবং বোধ হয় যে বিদেশীয়েরা তাঁহাকে ভাল বুঝিতে পারেন না। ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রাচীনা, গম্ভীরপ্রকৃতি, মাতৃভাবযুক্তা গৌতমী—পরম পবিত্র দৃশ্য! আশ্রমে যতগুলি ঋষিতপস্বী আছেন তিনি সকলেরই জননীস্বরূপ—তিনি সকলকেই বাপু, বাছা, যাদু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে জননীবৎ স্নেহ এধং সম্মান করেন। আবশ্যক হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া আব্দারও করেন—যথা শকুন্তলা :—

ইমং অসংবন্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং অজ্জাএ গোদমীএ নিবেদইস্সং।

সকলে যেমন তাঁহাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে তিনিও তেমনি সকলকে ভালবাসেন এবং সকলের ভাবনা ভাবেন। শকুন্তলা পীড়িতা—প্রায় উত্থানশক্তিরহিত। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া তাঁহার উত্তপ্তদেহে সুশীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছেন এবং পদ্মপত্রদ্বারা বীজন করিতেছেন। ওদিকে গৌতমী তাঁহার মঙ্গলার্থ পবিত্র শান্তিজল আনিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সিঞ্চন করিয়া সযত্নভাবে তাঁহাকে আশ্রমকুটীরে লইয়া যাইতেছেন। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে কণ্বও যেমন শকুন্তলার নিমিত্ত দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ

প্রার্থনা করিলেন, গৌতমীও তেমনি শকুন্তলাকে বনদেবী-দিগকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতে বলিয়া দিলেন। কিন্তু তার পর আর বেশী কথা কহিলেন না। একে ত তিনি বেশী কথা কন না, তাহাতে আবার তখন স্বয়ং কণ্ব যা বলিবার তা বলিতেছেন। কণ্ব যেমন তাঁহার পদমর্য্যাদা বুঝেন, তিনিও তেমনি কণ্বের পদমর্য্যাদা বুঝেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে পিতাপুত্রীর সেই হৃদয়বিদারক বিদায়দৃশ্য দেখিলেন। কণ্ব তাঁহারই হস্তে শকুন্তলাকে সমর্পণ করিয়া আশ্রমকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে গৌতমী একটি প্রধান চরিত্র। পুরুষচরিত্রগণের মধ্যে কণ্বের যে পদবী, স্ত্রীচরিত্রগণের মধ্যে গৌতমীর সেই পদবী। কণ্ব যেমন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ভিত্তিস্বরূপ, গৌতমীও সেইরূপ। গৌতমী না থাকিলে নাটকের কার্য্য চলিতে পারে না। গৌতমীকে কণ্বের অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেন না গৌতমীর সাহায্যব্যতিরেকে কণ্ব তাঁহার নিজের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে অক্ষম। এ কথার আরো একটি অর্থ আছে। শকুন্তলা রমণী। তিনি কণ্বের শাসনাধীন বটে। কিন্তু গৌতমীই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী এবং অধিনায়িকা। পুরুষ রমণীকে উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু রমণী ভিন্ন রমণীকে রমণী করিতে পারে না। শকুন্তলার সম্বন্ধে গৌতমী কণ্বের একটি উৎকৃষ্ট অংশ।

এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড পাওয়া গেল। মহর্ষি কণ্ব সেই মেরুদণ্ড, এবং গৌতমী, শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত সেই মেরুদণ্ডের অন্তর্গত। সে মেরুদণ্ডের এক

অর্থ মহর্ষি কণ্ব আর এক অর্থ ইহলোক এবং পরলোক, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, জ্ঞান এবং মোহ, স্ত্রী এবং পুরুষ, শান্তি এবং তেজ, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য। সে মেরুদণ্ডের অর্থও যা পূর্ব্বপরিচ্ছেদবিবৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থও তাই। সেই চমৎকার মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত মিলিত হইলেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সেই মিলনকার্য্যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চক্ষুকর্ণস্বরূপ। তাঁহাদের সাহায্যেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন এবং শকুন্তলা দুষ্মন্তকে চিনিলেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী। এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, এবং অনসূয়া এই তিনটিতে একটি। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন; তিনটির একই কাজ; তিনটির এক চিন্তা, এক হৃদয়। তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম হইতে শকুন্তলার আশ্রমত্যাগ পর্য্যন্ত সে ভালবাসার যে কত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে ভালবাসার রকম দেখিলে মোহে অভিভূত হইতে হয়—মনে হয় বুঝি স্বর্গে আসিয়া স্বর্গের সুরকন্যাদিগের ভালবাসা দেখিতেছি। শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া পরস্পরের প্রাণবায়ু, পরস্পরে পরস্পরের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারেন। এমন সরল পবিত্র এবং মিষ্ট সখ্যভাব আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু সকল বিষয়ে এক হইয়াও তিন জনে তিনটি ব্যক্তি। শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই

বয়স, কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম। শকুন্তলা এবং প্রিয়ম্বদা যৌবনে পড়িয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়াকে সে তরঙ্গ এখনও ভাল রকম লাগে নাই, এখনও যেন অনসূয়া হইতে সে তরঙ্গ কিঞ্চিৎ দূরে আছে। শকুন্তলা যখন তাঁহার প্রিয় বন-জ্যোৎস্নার শোভা একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, অনসূয়ে, শকুন্তলা কেন অমন করিয়া সহকারের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। অনসূয়া বলিল, আমি জানি না, তুমি আমাকে বলিয়া দেও। শকুন্তলা যখন একটি বৃক্ষের সম্মুখে একটু হেলিয়া দাঁড়াইলেন, তখন অনসূয়া কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন, শকুন্তলে, একটু ঐরকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ? প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন যে তুমি ঐরকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে ঠিক্ বোধ হইতেছে যেন কেশরবৃক্ষটির একটি রমণীয় লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। কিন্তু এত রসের কথা শুনিয়াও অনসূয়ার মুখে কথাটি নাই। অনসূয়া কেবল তরুলতা লইয়া ব্যস্ত। শকুন্তলা অনসূয়াকে তাঁহার বুকের বল্কল একটু আল্গা করিয়া দিতে বলিলেন। অনসূয়া কোন কথা না বলিয়া বল্কল আল্গা করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে। প্রিয়ম্বদা রঙ্গ করিতে ভাল বাসেন; শকুন্তলা রঙ্গ বুঝেন, কিন্তু রঙ্গ করিতে পারেন না; অনসূয়া রঙ্গ করিতে শেখেন নাই। অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম। যখন

দুষ্মন্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা তিন জনেই কিছু জড়সড় হইলেন। কিন্তু অনসূয়াই অগ্রে দুষ্মন্তের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার প্রস্তাব করিলেন, এবং প্রিয়ম্বদা ও শকুন্তলাকে তাঁহার কাছে বসিতে আহ্বান করিলেন। সকলে বসিলে পর প্রিয়ম্বদার জানিবার ইচ্ছা হইল যে অভ্যাগত ব্যক্তি কে? কিন্তু তিনি নিজে দুষ্মন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; অনসূয়াকে চুপি চুপি বলিলেন, এই মহাশয় ব্যক্তি কে? অমনি অনসূয়া বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি; বলিয়াই অকুতোভয়ে অবিচলিতভাবে দুষ্মন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রিয়ম্বদা কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু অনসূয়া আগ্রহসহকারে শকুন্তলার ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি একবার লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেমন বলিতেছিলেন তেমনি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার ইতিহাস শেষ হইল এবং দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে কণ্বের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন, তখন বালিকা আর কোন কথা বলিল না, তখন প্রিয়ম্বদা ঠাকুরাণী ঘটকালী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শকুন্তলাকে লইয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে অনসূয়া নিস্তব্ধ। তার পর যখন সকলে আশ্রমকুটীরে যান, তখন শকুন্তলা অনসূয়াকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমার পায় কাঁটা ফুটিয়াছে এবং বল্কল গাছের ডালে আটকাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার মনে কাঁটা ফুটিয়াছে,

ঠাট্টার ভয়ে প্রিয়ম্বদাকে বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, তাই সরলা বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন। তার পর যখন শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিমিত্ত মৃতপ্রায়, তখন অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার সত্বর এবং গোপনীয় ভাবে মিলন হইতে পারে। প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে কি রকমে গোপনীয়ভাবে মিলন হয় ইহাই বিবেচ্য বিষয়, সত্বর মিলনের বিষয়ে কোন ভাবনা নাই। অনসূয়া যেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন কথা? তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন দুষ্মন্তের হাব ভাবে বুঝা গিয়াছিল তিনি শকুন্তলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। বালিকা অনসূয়া এত বুঝে না। এখন সব বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও মিলনের কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী মদনলেখ্যের প্রস্তাব করিলেন। অনসূয়া সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী। তার পর যখন দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন তখন অনসূয়া তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জ্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল তখন প্রিয়ম্বদাই একটা ছল করিয়া অনসূয়াকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোট ফোট। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিতপদ্মের ন্যায় সে ফুলের সমস্ত গৌরব পাপ্‌ড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদা গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাইতেই

চারিদিকে সুগন্ধ ছাড়াইতেছেন। অনসূয়ার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্যময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে। কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারীপ্রকৃতির প্রতিমা অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভিপ্রায়—জড়জগৎ এবং অন্তর্জগতের সম্বন্ধপ্রকাশ। অভিজ্ঞানশকুন্তলে জড়জগতের শক্তি এবং অন্তর্জগতের শক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চিত্রিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের দুইটি ভাগ আছে। একভাগে জড়জগতের চিত্র অর্থাৎ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ঐন্দ্রিয়িক মিলনের কথা,—প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেন না, তাঁহাদের সাহায্যেই ঐ মিলন ঘটিল। আর এক ভাগে অন্তর্জগতের চিত্র অর্থাৎ দুষ্মন্তের মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তির কথা,—বৃদ্ধ কঞ্চুকী, বেত্রবতী, মাতলি এবং অন্তরীক্ষস্থিত স্বয়ং ইন্দ্রদেব এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুষ্মন্তের মানসিকশক্তি বিজ্ঞাপিত। দুষ্মন্ত যখন স্মৃতিলাভ করিয়া শকুন্তলার মোহে অচেতনপ্রায় তখন ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেবশত্রুদমনার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহার মানসিক শক্তির চমৎকার পরিচয় দেওয়াইলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষস্থিত। মহাকবি তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করেন নাই। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেই বুঝেন। মহাকবি তাঁহাকে অন্তরীক্ষে রাখিয়া দুষ্মন্তের বীরত্বের চিত্র বেশী জাজ্বল্যমান এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন।

মাতলি ইন্দ্রের সারথি। সারথির কার্য্যে মাতলি অদ্বিতীয়। সপ্তমাঙ্কে বর্ণিত রথযাত্রা মাতলির সারথিত্বের অপূর্ব্ব পরিচয়। বেত্রবতী প্রভৃতি রাজভক্তি এবং রাজকার্য্যানুরাগের চমৎকার দৃষ্টান্ত। বৃদ্ধ কঞ্চুকী বড়ই মনোহর চরিত্র। তিনি রাজসেবায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একটি অশীতিবর্ষীয় অমায়িক এবং গম্ভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধবর যষ্টির উপর ভর দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে দুষ্মন্তের প্রশংসা ধরে না, কেন না দুষ্মন্ত যেমন নামেও রাজরাজেশ্বর, তেমনি কাযেও রাজরাজেশ্বর।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের আরও একটি অংশ আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগতের এবং জড়জগতের যুদ্ধে জড়জগৎ জয়ী হইয়াছিল। বীরপ্রধান দুষ্মন্তের রিপুর শাসনে পদস্খলন হইয়াছিল। ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত রিপুর শাসনে ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মরূপ কণ্বকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে গিয়া দুষ্মন্ত তাঁহার নিজের এবং শকুন্তলার মেরুদণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মহাপাপ হইল। নৈতিক নিয়ম অথবা Law তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিয়ম অথবা Law অতি কঠোর পদার্থ। সেই কঠোরতা দুর্ব্বাসায় প্রতিফলিত। পাঠক এইখানে মনে রাখিবেন যে দুর্ব্বাসা শুধু নিজের নাম করিয়া নয়, সামাজিক নিয়মের নাম করিয়াও শাপ দিয়াছিলেন। নিয়ম যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, দুর্ব্বাসাও তেমনি আমাদের চক্ষের অগোচর—তিনি সকলের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শাপ দিয়া গেলেন।

প্রিয়ম্বদা ছুটিয়া গিয়া শকুন্তলাকে শাপমুক্ত করাইবার জন্য তাঁহাকে কত অনুনয় করিলেন। কিন্তু নিয়ম যেমন নির্দ্দয় তিনিও তেমনি নির্দ্দয়। তিনি কোন কথা শুনিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তিনি কেবল এই কথা বলিয়া গেলেন যে, অভিজ্ঞানাভরণ দর্শন করাইলে শাপের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু শকুন্তলা সে অভিজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি সে অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলেন না। তখন অদৃষ্ট আসিয়া তাঁহাকে এবং দুষ্মন্তকে অনন্তযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। মনুষ্যের সুখ দুঃখ শুধু নিয়মাধীন নয়; অদৃষ্ট (chance) অথবা দৈবও তাহার একটি প্রধান কারণ। কি পাপী কি পুণ্যবান্ অদৃষ্ট সকলেরই সহায়তা করে. তাহাতে আবার দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা মহাভ্রমে পড়িয়াও পবিত্রচিত্ত। মহাকবি রাজযোটক পাইলেন। অদৃষ্ট দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সহায় হইল। এবং অদৃষ্ট সহায় হইয়া তাঁহাদের পতিপত্নীসম্বন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে প্রমাণ করিয়া দিল। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। এখন আবশ্যক হইলে সমস্ত সমাজ তাঁহাদের পরিণয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে সক্ষম। হৃদয়ের অভিজ্ঞান সামাজিক অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষিত নিয়ম বিজয়ী হইল। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাও পুনর্ম্মিলিত হইলেন। অদৃষ্ট নিয়মের পোষকতা করিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অদৃষ্টের অর্থ—ধীবর, রাজশ্যালক, প্রহরিদ্বয়, ইত্যাদি। এই কয়জনের চিত্র অতি চমৎকার। কি কথাবার্ত্তার প্রণালীতে, কি স্বভাব-চরিত্রে,

ধীবর যথার্থই ধীবর, প্রহরিদ্বয় যথার্থই প্রহরিদ্বয়, রাজশ্যালক যথার্থই শ্যালকরাজ—বেশ মজার মানুষ। লোকে বলিয়া থাকে যে সেক্সপীয়র কি উচ্চ কি নীচ, কি গম্ভীর কি হাল্কা, সকল রকম চরিত্র আঁকিতে সুনিপণ। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িলে, মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়। কণ্ব, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, কঞ্চুকী, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, রাজশ্যালক, ধীবর, প্রহরী—এই কয়খানি চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যচরিত্রের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সমস্তই কালিদাসের আয়ত্তাধীন। আবার যখন শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখা যায় তখন ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবি নবপ্রসূত শিশুসন্তান হইতে মুমূর্ষুবৎ বৃদ্ধবর পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মা দিব্যচক্ষে দেখিতে পান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প।

অভিজ্ঞানশকুন্তল যে রকমে সমালোচনা করিয়াছি তাহা হইতে নাটক কাহাকে বলে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথম পরিচ্ছেদে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি তাহা নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে রকম সম্পর্ক থাকা উচিত তাহাকে নাটকের আকার-গত নাটকত্ব বলে। এই সম্পর্কের নাম একত্ব বা সাম্য-ভাব। যে মানসিক শক্তি অথবা মানসিক প্রবৃত্তি সকল অবস্থাতে নিজ প্রকৃতি রক্ষা করে তাহাই নাটকে চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটকের নায়ক যে সকল কার্য্য করেন সে সমস্ত কার্য্যেরই একটি নির্দ্দিষ্ট ভাব অথবা প্রকৃতি থাকে। এবং সেই কারণ বশতঃ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটি একতাসম্বন্ধ অথবা সাম্যভাব লক্ষিত হয়। তাহাই নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। এই একতা রক্ষা অথবা সাম্যভাব প্রদর্শনই নাটককারের কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রভূত ক্ষমতার প্রয়োজন। মনে কর কোন একটি বিশেষ চরিত্র নাটকে চিত্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত জীবনে অর্থাৎ জগতের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে কখন কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে তাহাই দেখাইতে হইবে। সমস্যাটির গুরুত্ব

এবং কঠিনতা বুঝিয়া দেখ। সংসার একটি ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্য। তথায় কিছুর ই স্থিরতা নাই, সকল ই অনিশ্চিত। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কাল তিনি পথের ভিখারী। এই মুহূর্ত্তে যিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ত পর মুহূর্ত্তে তিনি বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত। প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থাতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সেই চরিত্রের গুণে যেমন যেমন কার্য্য করিলে তাঁহার চরিত্রের সার্থকতা হয় নাটককার তাঁহাকে সেই রকম কার্য্য করান। অর্থাৎ তাঁহার যে রকম চরিত্র তাহাতে যে অবস্থায় তাঁহার যে রকম কার্য্য করা, কথা কওয়া, বা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এবং সঙ্গত, নাটককার তাঁহাকে তাহাই করান। নাটকের পাত্রের প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক কথাতে তাঁহার চরিত্র প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। তিনি নানাবিধ অবস্থায় নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন এবং নানাপ্রকার কথা কহিবেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত নাটকের পাত্র হন, তবে তাঁহার প্রতি কার্য্য তাঁহার ই কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি কথা তাঁহার ই কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিতে পারা চাই। বুঝিতে পারা চাই যে তিনি যে অবস্থায় পতিত সে অবস্থায় তিনি যে কার্য্য করিতেছেন বা কথা কহিতেছেন সে কার্য্য এবং সে কথা তিনি যে চরিত্র-বিশিষ্ট সেই চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অপর কাহারো হইতে পারে না। অর্থাৎ, কোন একটি জ্যামিতি-সূত্র হইতে যেমন অপরাপর জ্যামিতি-সূত্র অবশ্য নিঃসৃত হয়, তেমনি নাটকের পাত্রের সমস্ত কার্য্য এবং

সমস্ত কথা তাহার চরিত্র হইতে অবশ্যনিঃসৃত বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই। এবং প্রকৃত নাটকে তাহাই হইয়া থাকে। হ্যামলেটের কথা হ্যামলেটের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না ; ইয়াগোর কথা ইয়াগোর ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না ; দুষ্মন্তের কথা দুষ্মন্তের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না ; শার্ঙ্গরবের কথা শার্ঙ্গরবের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; প্রিয়ম্বদার কথা প্রিয়ম্বদার ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণেই আকার-গত বা প্রত্যক্ষ নাটকত্ব। অধিকন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃত নাটককার সামান্য চরিত্র চিত্রিত করেন না। যে চরিত্র চিত্রিত করিলে মনুষ্য জাতির শিক্ষালাভ হইতে পারে তিনি সেই চরিত্র ই চিত্রিত করিয়া থাকেন! কিন্তু চরিত্র শুধু গুরুত্বগুণবিশিষ্ট হইলে ই হয় না। একজন উন্নত-চরিত্র ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে অথবা ভোজন করিতে অথবা পুস্তক পাঠ করিতে দেখিলে কোন শিক্ষালাভ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বিপদ্‌জনক অবস্থায় কার্য্য করিতে দেখিলে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত ই নাটককার কোন গুরুত্বগুণ-বিশিষ্ট চরিত্রকে কোন অসামান্য অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার ছবি তুলিয়া দেন। সে ছবি তদ্রূপ-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কার্য্যে এবং প্রতি কথায় আঁকা থাকে। কত ক্ষমতা থাকিলে তবে সে রকম ছবি তুলিতে পারা যায়! আমাদের মধ্যে এ কথা সকলে বুঝেন না বলিয়া, প্রতি বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে

প্রত্যক্ষ অথবা আকার-গত নাটকত্বের বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহা কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের সম্বন্ধে বলিয়াছি—তাহা কেবল নাটকের শ্রেণী বিশেষ সম্বন্ধে ই খাটে। এখন ঐ নাটকত্ব বিষয়ে যাহা বলিলাম তাহা নাটক মাত্রেই প্রযোজ্য। এই নাটকত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথম পরিচ্ছেদে অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে কতকগুলি প্রমাণ বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রতি শব্দে এই নাটকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক ইচ্ছা করিলে ই তাহা দেখিতে পারেন। দেখিলে নিশ্চয় ই চমৎকৃত হইবেন।

এখন বুঝা যাইতেছ যে প্রত্যক্ষ বা আকারগত নাটকত্ব ভালরূপে দেখাইতে পারিলেই ভাল নাটক হয় না। অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব ভাল হইলেই তবে ভাল নাটক হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি। যে চরিত্র-নিঃসৃত কার্য্যপ্রণালী নাটকে চিত্রিত হয় সে চরিত্র যতই গভীর, দৃঢ়মূল এবং ব্যাপক হয় ততই তাহার নাটকের চরিত্র বলিয়া উৎকর্ষ এবং সার্থকতা হয়। দুষ্মন্তের চরিত্র লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। সে চরিত্রের কত দৃঢ়তা, গভীরতা এবং ব্যাপকতা তাহা বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে সে চরিত্রের অর্থও যা সমস্ত মনুষ্যসমাজের অর্থও তা। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞানশকুন্তল এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক।

কিন্তু আকারগত এবং চরিত্রগত নাটকত্ব ছাড়া, অভি-

জ্ঞানশকুন্তলে আর এক রকম নাটকত্ব আছে। তাহা পঞ্চম পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি। দুষ্মন্তের প্রেমের ইতিহাসের অর্থ এই যে জগৎ যে দুইটি উপাদানের সমষ্টি, অর্থাৎ জড়ত্ব এবং সূক্ষ্মতা অথবা প্রকৃতি এবং পুরুষ, সে দুইটি উপাদান পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের সংযোগ বা মিলন নিয়মাধীন না হইলে বিষম অনিষ্টের কারণ হয়। এই মহাতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রথমতঃ একটি প্রত্যক্ষ বা আকার-গত নাটকত্ব আছে; সে নাটকত্ব ব্যক্তি বিশেষে সম্বদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, একটি অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব আছে; সে নাটকত্ব মনুষ্যবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মনুষ্যসমাজ ব্যাপিয়া আছে। তৃতীয়তঃ, একটি দার্শনিক বা জাগতিক (cosmic) নাটকত্ব আছে; সে নাটকত্ব মনুষ্য বিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এত গভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে কয় খানা নাটকে আছে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা তিন কি চারি খানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই তিন চারি খানার মধ্যে এক খানা। গেটের 'ফাউষ্ট' আর এক খানা। সেক্ষপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েট' ও আর এক খানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং 'ফাউষ্ট' অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের যথার্থ প্রকৃতি বুঝা গেল, ইহার প্রকৃত লক্ষণ কি তাহা বুঝা গেল। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে গল্প রচনা নাটককারের কার্য্য নয়। অনেকে তাহাই মনে করেন বটে, কিন্তু সেটি ভ্রম। যাঁহারা নাটককারকে

গল্পলেখক বলিয়া বুঝেন তাঁহাদের মনে করা উচিত যে অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প মহাভারত হইতে গৃহীত এবং সেক্সপীয়রের প্রায় সকল নাটক গুলি প্রচলিত গল্প লইয়া রচিত। কিন্তু গল্পরচনা নাটককারের কার্য্য না হইলেও নাটকের গল্প একটি স্বতন্ত্র জিনিস। নাটকের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নাটককার-গৃহীত গল্প কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে সকল প্রচলিত গল্প লইয়া সেক্সপীয়র নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসও তাহাই করিয়াছেন। মহাভারতে যে শকুন্তলোপাখ্যান আছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই। দুষ্মন্ত একদা মৃগয়ায় গিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে মহর্ষি তথায় নাই, কেবল শকুন্তলা আছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া লালসায় অধীর হইয়া শকুন্তলার জাতি নির্ণয় করণানন্তর এক রকম বলপূর্ব্বক তৃপ্তি সাধন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কণ্ব আসিয়া এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুমোদন করিয়া শকুন্তলার একটি পুত্র সন্তান হইলে পর তাঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন দুষ্মন্ত ভাণ করিতে লাগিলেন যে তিনি শকুন্তলাকে কখন দেখেন নাই এবং বিবাহও করেন নাই। শকুন্তলা অপমানিতা সাধ্বীর ন্যায় দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হইল যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে "আমি জানি যে শকুন্তলা আমার পত্নী এবং এই পুত্রটি আমারই পুত্র, কিন্তু সহসা গ্রহণ করিলে পাছে লোকে আমাকে দোষী

বিবেচনা করে এবং এই পুত্রটি কলঙ্কী হয় এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম”। এ গল্পে দুষ্মন্তের চরিত্রে কোন মাহাত্ম্য লক্ষিত হয় না, তিনি কেবল একজন কামুক পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান। এ রকম গল্প নাটকের গল্প হইতে পারে না। সেই জন্য কালিদাস এই গল্পটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। কালিদাসের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড়জগতের স্বাধীনতা চিত্রিত করা এবং কি উপায়ে ঐ দুই জগতের মধ্যে শান্তি এবং সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করা। অতএব মহাভারতের গল্পটি পরিবর্ত্তন না করিয়া লইলে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, কেন না সে গল্পে কেবল ঐন্দ্রিয়িক বা জড়জগতের কার্য্য বর্ণিত আছে। কালিদাসের দুইটি শক্তির প্রয়োজন—মানসিক শক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তি। অতএব যাহাতে দুইটি শক্তির কার্য্যই উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইতে পারে তিনি এমনি করিয়া মহাভারতের গল্পটিকে গড়িয়া লইলেন। তিনি দুষ্মন্তকে দুইটি ভিন্ন আকারে প্রদর্শন করিলেন। এক আকারে দুষ্মন্ত ইন্দ্রিয়ের শাসনে পরাভূত, বিলাসবাসনায় বিহ্বলমতি, সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবমুগ্ধ। আর এক আকারে দুষ্মন্ত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, শ্রমশীল, বিলাসবিদ্বেষী, আত্মভাবশূন্য, পরদুঃখকাতর, পরসুখান্বেষী, আত্মেতরভাবের পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। এই দুইটি মূর্ত্তি যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে তাহা কি চমৎকার! মহাভারতের উপাখ্যানে ঐন্দ্রিয়িক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া দুষ্মন্তের কামমুগ্ধাকৃতি চিত্রিত করিলেন। কিন্তু

মহাভারতের উপাখ্যানে মানসিক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হয় নাই। সেই জন্য মহাকবি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আশ্রমাক্রমণ, রাজমাতাপ্রেরিত সম্বাদ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্য কল্পনা করিলেন। এই সকল ঘটনায় দুষ্মন্তের সৎপ্রবৃত্তি এবং মানসিক শক্তি কি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি। এখন আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে এবং রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় দুষ্মন্তের মোহবিজয়ী মানসিক শক্তির চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাক্ষসগণকর্ত্তৃক আশ্রমাক্রমণ এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্য কল্পনা মহাকবির প্রতিভার চরম কীর্ত্তি। দুষ্মন্ত ঐন্দ্রিয়িক লালসায় জর্জ্জরিতদেহ, পার্থিবমোহে মধুকলসমগ্ন মধুকরাপেক্ষাও মুগ্ধ, পার্থিবভাবে জড়জগতাপেক্ষাও জড়তাময়। কিন্তু নিমেষমধ্যে দুষ্মন্ত বীরভাবে উন্মত্ত, উন্নত হৃদয়াবেগে যেন পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন দিব্যালোকে সন্তরণ করিতেছেন, যে স্থানে মাটীর সহিত মাটী হইয়া বসিয়াছিলেন সে স্থান তুচ্ছ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিকানা নাই, সত্যই যেন একটা জগৎ অনন্তদূরে ফেলিয়া রাখিয়া আর একটা সর্ব্বরকমে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করিয়াছেন। যে দুই ঘটনায় এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয় সে দুই ঘটনা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের উপাখ্যানের অংশ নয়। সে উপাখ্যান হইতে সেই দুই ঘটনার উৎপত্তি হয় নাই এবং

হইতে ও পারে না। কিন্তু সেই জন্য ই আমরা সেই দুই ঘটনার এত চমৎকারিত্ব দেখিতেছি। অভিজ্ঞানশকুন্তল আধ্যাত্মিক প্রণালীর নাটক। সে নাটকে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে উপাখ্যানমূলক অথবা বাহ্যগ্রন্থি কখনই থাকিতে পারে না। দুইটা ভিন্ন জগতের কথায় সমস্ত ঘটনা এক সূত্রে গ্রথিত হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত যে দুই ঘটনার কথা বলিতেছি সেই দুই ঘটনার এবং রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা প্রভৃতি অপরাপর মানসিকশক্তিপ্রকাশক ঘটনার প্রকৃত গ্রন্থি দুষ্মন্তের মনে। সেই মনের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যে ই তাহাদের সার্থকতা এবং নাটকের মধ্যে স্থান। কালিদাস! তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে। দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, ‘ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।’

জড়জগতের শক্তি এবং মানসিক জগতের শক্তি এই দুই শক্তি পরস্পর স্বাধীন। যেখানে একটি শক্তি প্রবল সেখানে অন্যটি ও প্রবল হইতে পারে। শুধু তাও নয়। জগতে জড়জগতের শক্তি মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবল। সেই নিমিত্ত মহাভারতে বর্ণিত দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় প্রণালী পরিবর্ত্তন না করিয়া মহাকবি অসীমমানসিকশক্তি-সম্পন্ন দুষ্মন্তকে রিপুর শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট করিয়া চিত্রিত করিলেন। কিন্তু জড়জগৎ এবং মানসিক জগৎ পরস্পর স্বাধীন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন

করা অর্থাৎ জড়জগৎকে মানসিক জগতের অধীন করা মনুষ্য জীবনের প্রধান অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, এবং অবশ্যকরণীয় কার্য্য। কেন না মনুষ্য-জীবনে জড়জগতের শক্তি মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইলে জীবন যন্ত্রণাময় হয় এবং মনুষ্যসমাজ নিয়মশূন্য হইয়া বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়। দুষ্মন্তের ঐন্দ্রিয়িক শক্তি তাঁহার মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইল। এবং সেই নিমিত্ত যে শাপ এবং শাপোদ্ভূত ঘটনাবলী মহাভারতের আখ্যায়িকায় নাই মহাকবি তাহা কল্পনা করিলেন। এই কল্পনার গুণে মহাভারতের অসম্পূর্ণ আখ্যায়িকা সংসারক্ষেত্রের সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া উঠিল।

মহাভারতের উপাখ্যানে একটি দৈববাণীর কথা আছে। দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া শকুন্তলা যখন ক্রোধভরে পৌরবসভা হইতে চলিয়া যাইতেছেন তখন দৈববাণী হইল যে তিনি দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। সেই দৈববাণী শুনিয়া সকলে বুঝিল যে শকুন্তলা যথার্থই দুষ্মন্তের পত্নী এবং দুষ্মন্তও তখন লোকাপবাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন। কালিদাসের উপাখ্যানে সে দৈববাণী নাই। কেন না যেখানে দুর্ব্বাসার শাপ সেখানে সে দৈববাণী থাকিতে পারে না। এবং সে দৈববাণী থাকিলে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার যন্ত্রণাভোগ হয় না। অতএব কালিদাস সে দৈববাণীর কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য রকমে তাঁহার নায়ক এবং নায়িকার মিলন সংঘটন করিলেন। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তি দ্বারা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় প্রমাণীকৃত হইল এবং দুষ্মন্ত ও সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া বিষম

যন্ত্রণা ভোগ করত তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পরে সেই যন্ত্রণা-বিহ্বল অবস্থায় দুষ্মন্ত তাঁহার গভীর আভ্যন্তর ভাবের এবং অসাধারণ মোহবিজয়ী শক্তির একটি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করত তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উৎকৃষ্টতা সাব্যস্ত করিলে পর পুরস্কার স্বরূপ রমণীরত্ন শকুন্তলাকে পুনর্লাভ করিলেন।

কালিদাস মহাভারতের উপাখ্যান কি প্রণালীতে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন তাহা বুঝাইলাম। পরিবর্ত্তনানন্তর উপাখ্যানটি কি রকম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। কালিদাসের উপাখ্যানের প্রধান প্রধান ঘটনা এই ঃ—প্রথম, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অবতারণা; দ্বিতীয়, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রণয়সঞ্চার এবং ঐন্দ্রিয়িক মিলন; তৃতীয়, দুর্ব্বাসার শাপ এবং দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান; চতুর্থ, অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনানন্তর দুষ্মন্তের যন্ত্রণাভোগ; পঞ্চম, দুষ্মন্তের দেবলোকে দেবশত্রুদমন; ষষ্ঠ, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পুনর্মিলন। যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত, তখন উভয়কেই আমরা ফোটনোন্মুখ মুকুলের মতন দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটি বিশেষ অবস্থার দিকে যাইতেছেন, যেন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন পড়িলেন, যেন প্রণয়ানুরাগে মুগ্ধ হইলেন হইলেন, যেন ঊষা ভাঙ্গিয়া দিবালোক প্রকাশ হয় হয়। দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া পড়ে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সেই অস্ফুট রাগ ও তেমনি পূর্ণগৌরবে প্রদীপ্ত হইল, যেন ঊষার অস্ফুট রাগ

মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিল—দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা সেই বিষম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া তৃণ নির্ম্মিত পুত্তলির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছেন—যেন তাঁহাদের চেতনা নাই, জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই—যেন তাঁহারা জড়-জগতের জড়তা মাত্র। সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন। কোথায় হইতে যেন এক অসীম-তেজ-সম্পন্ন, জ্ঞানময়, অনন্তপুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন প্রলয়-তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে শকুন্তলা কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, দুষ্মন্ত প্রলয়-যন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রলয়াধীন। অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল—দেবলোক শত্রুপীড়িত। দুষ্মন্ত প্রলয়ভেদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভাসিত হইল। সেই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে, সেই হেমকূট শিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পতি-পত্নী ভাবে দণ্ডায়মান—উভয়েই পাণ্ডুবর্ণ, উভয়েই শীর্ণ-দেহ, উভয়েই বিমর্ষ, যেন অতি-নির্ম্মল-জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাস্থিত দুই খানি পবিত্র চেতনা-খণ্ড! কি দেখিয়াছিলাম আবার কি দেখিতেছি! বসন্তের রাগগর্ভ মুকুল শরতের ম্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। রাগময় জড়তা চিন্ময় ভাবে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গভূমি। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাকবির মহাস্বপ্নের আকার। পৃথিবী

হইতে স্বর্গ—এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ। গেটে সত্য ই বলিয়াছেন ঃ—

> "Wouldst thou the young year's blossoms
> and the fruits of its decline,
> And all by which the soul is charmed,
> enraptured, feasted, fed?
> Would thou the earth and heaven itself in
> one sole name combine?
> I name thee, O Sakoontala! and
> all at once is said."

এই জড়তাময় পৃথিবী এবং এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ!—যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী চরণে দলিত করিতে পারেন এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ তাঁহারই, তিনিই এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গের নির্ম্মাণকর্ত্তা। যিনি এই জড়তাময় পৃথিবীর প্রতি আত্মাময় পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করেন। প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর স্বাধীন। কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ। দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন। মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার—পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকার-গত সৌন্দর্য্য, জর্ম্মান নাটকের প্রণালী-গত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরাজি নাটকের কার্য্য-গত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম অভিজ্ঞানশকুন্তল।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প মহাভারতের গল্প অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট তাহা দেখা হইল। দুই গল্পের মূল এক, কিন্তু পরিণতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার গুণেই নাটকের গল্পটির উৎকর্ষ। এই বিভিন্নতা সম্পাদনই নাটককারের কার্য্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলে সেই কার্য্য কি আশ্চর্য্য প্রতিভা-সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মনুষ্যমাত্রই যেন জীবনরূপ মহানাটকে সেই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন!

সম্পূর্ণ।

MOHARAJAH'S LIBRARY
5 MAR 1889
COOCHBEHAR.

PRINTED BY K. N. BHATTACHARJI AT THE NEW ARYA PRESS,
43/1 *Bhowani Churn Dutt's Lane, Calcutta.*